বাংলাদেশ
জার্নাল
অব
পলিটিক্যাল
ইকোনমি

© ২০২১ বাংলাদেশ জার্নাল অব পলিটিক্যাল ইকোনমি
খণ্ড ১, সংখ্যা ১, ডিসেম্বর ২০২১, পৃষ্ঠা, ৩০৫-৩৪৫
বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি
(আইএসএসএন ২২২৭-৩১৮২)

হোম ইন দ্য ওয়ার্ল্ড: আ মেমোয়ার*

অমর্ত্য সেন

স্মৃতিকথা: ঘরে-বাইরে

মূল: **অমর্ত্য সেন**

অনুবাদ: আহমেদ জাভেদ**

⌑ মুখবন্ধ ⌑ ঢাকা ও মান্দালয় ⌑ বাঙলার নদী

অনুবাদকের কথা

প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ ও দার্শনিক অমর্ত্য সেন আমাদের সময়ের একজন অগ্রগণ্য চিন্তাবিদ। নোবেল পুরস্কারে সম্মানিত অধ্যাপক অমর্ত্য সেনের লেখা গ্রন্থ ৫০টির বেশি ভাষায় অনূদিত হয়েছে। বাংলা তাঁর মাতৃভাষা। তিনি বাংলা ভাষার আদি উৎস—সংস্কৃত ভাষারও একজন পণ্ডিত ব্যক্তি। সম্প্রতি ইংরেজি ভাষায় তাঁর সুলিখিত আত্মজীবনী "হোম ইন দ্য ওয়ার্ল্ড: আ মেমোয়ার" প্রকাশিত হয়েছে বিখ্যাত প্রকাশনী পেঙ্গুইনের অ্যালেন লেন থেকে। এটি জুলাই ২০২১ সালের ঘটনা। গ্রন্থটি প্রকাশিত হওয়ার

---

* অধ্যাপক অমর্ত্য সেনের বহুল প্রতীক্ষিত আত্মজীবনী "হোম ইন দ্য ওয়ার্ল্ড: আ মেমোয়ার" (স্মৃতিকথা: ঘরে-বাইরে) প্রকাশিত হয়েছে ২০২১ সালের জুলাই মাসে বিখ্যাত পেঙ্গুইন বুক্সের এ্যালেন লেন প্রকাশনী থেকে। অধ্যাপক সেনের এ আত্মজীবনী গ্রন্থে তাঁর জীবনের প্রথম ৩০ বছরের (১৯৩৩ থেকে ১৯৬৩ সাল পর্যন্ত) বিবরণ অত্যন্ত সমৃদ্ধভাবে বিধৃত হয়েছে। ৪৮০ পৃষ্ঠার গ্রন্থটি ৫টি খণ্ডে ভাগ করা হয়েছে। ১ম খণ্ডে রয়েছে ৬টি অধ্যায়—ঢাকা ও মান্দালয়, বাঙলার নদী, দেয়ালবিহীন স্কুল, নানা-নানির সাহচর্য, তর্কবিশ্ব এবং বিগতের বিদ্যমানতা। ২য় খণ্ডে ৪টি অধ্যায়—সর্বশেষ দুর্ভিক্ষ, বাঙলা ও বাংলাদেশের ধারণা, প্রতিরোধ ও বিভক্তি এবং ব্রিটেন ও ভারত। ৩য় খণ্ডে ৫টি অধ্যায়—কলকাতার নাগরিকতা, কলেজ স্ট্রিট, মার্কস বিষয়ে করণীয়, প্রারম্ভিক যুদ্ধ এবং যুক্তরাজ্যের পথে। ৪র্থ খণ্ডে ৯টি অধ্যায়—ট্রিনিটির দরজা, বন্ধুবান্ধব ও পরিচয়ের বৃত্ত, কোন অর্থনীতি?, ইউরোপ কোথায়?, কথোপকথন ও রাজনীতি, কেমব্রিজ ও কলকাতার মধ্যে, ডব, ট্রাফা ও রবার্টসন, আমেরিকার মুখোমুখি এবং পুনঃপরীক্ষায় কেমব্রিজ। ৫ম খণ্ডে রয়েছে ২টি অধ্যায়— প্ররোচনা ও সহযোগিতা এবং দূরে-কাছে।

** সহকারী অধ্যাপক, অর্থনীতি বিভাগ, দ্য পিপল্স ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ; বুদ্ধিবৃত্তিক সংগঠন 'বাঙলার পাঠশালা ফাউন্ডেশন'-এর প্রতিষ্ঠাতা ও সভাপতি; 'বাংলা ভাষায় অমর্ত্য সেন পাঠচক্র'র সমন্বয়ক। ফোন: ০১৯১৪৪৪৪৩২০, ই-মেইল: ronieleo@gmail.com

পরের মাসে, অর্থাৎ আগস্ট মাসে আমি অধ্যাপক অমর্ত্য সেনের কাছ থেকে বাংলা ভাষায় গ্রন্থটি অনুবাদের অনুমতি পাই। এটি আমার জন্য ছিল একইসঙ্গে আনন্দের এবং শঙ্কার। এই শঙ্কার কারণ হলো—এই বইটিতে তাঁর জীবন-নদীটি যেসব ঘটনা পরিক্রমায় বিভিন্ন বাঁক নিয়েছে এবং তাঁর ভেতরের সত্তাকে প্রবলভাবে নাড়া দিয়েছে, সেসব অভিজ্ঞতার নির্যাস তিনি আমাদের সামনে উপস্থাপন করেছেন সহজবোধ্য ভাষায়। বইটির প্রতিটি বাক্য কথোপকথনের ভঙ্গিতে লেখা এবং মনে হবে অধ্যাপক সেন আপনার সঙ্গেই 'কথা কইছেন'। বইটি পড়া শুরু করলে এর বিষয়বস্তু ও ভাষার কোমল সৌরভ আপনার মনকে মোহিত করে তুলবে। তাঁর জীবনের প্রথম ৩০ বছরের ঘটনাবলী নিয়ে লেখা গ্রন্থটি পড়া শেষ করলেও পাঠকের মনটা ভরবে না, বরং পাঠক তাঁর আত্মজীবনীর দ্বিতীয় খণ্ড পড়ার জন্য ব্যাকুল হবেন।

সুতরাং, একজন অনুবাদক যখন এমন একজন বিদগ্ধ মনিষীর ইংরেজিতে লেখা বইয়ের বাংলায় ভাষান্তরকর্মটি করেন, যাঁর নিজের মাতৃভাষা আবার বাংলা—তখন অনুবাদকের জন্য কাজটি বেশ ঝুঁকির বৈকি! কারণ, ভুলত্রুটি হলে অধ্যাপক সেনের কথাই লোকে বলবেন, যদিও এই কাজে (বাংলায় ভাষান্তর) তাঁর নিজের কোনো 'দায়' নেই। অর্থাৎ, ভুলের কাজটি করেছেন একজন অনুবাদক, আর বদনাম কুড়াতে হচ্ছে একজন নির্দোষ লেখককে। তা ছাড়া এই অনুবাদকর্মটি বাংলা ভাষায়, বিধায় এমন অনেক জায়গা থাকবে—যেখানে লেখকের ইংরেজিতে নিজস্ব ভাব প্রকাশের ভঙ্গিটির মাত্রা-ধরণ হয়তো ভিন্ন হতোই, ফলে অধ্যাপক সেনের স্বকীয় প্রকাশভঙ্গির তৃপ্তি এখান থেকে পুরোপুরি পাবেন না—যদিও লেখাটি তাঁর নামেই ছাপা হচ্ছে।

উল্লিখিত খামতি ছাড়াও সব অনুবাদকর্মের দুটি প্রায় চিরন্তন সমস্যা আমার এই অনুবাদেও রয়েছে, যে সম্পর্কে এই জার্নালের সম্পাদক আমাকে সচেতন করেছেন। অনুবাদের চিরন্তন ওই সমস্যা দুটির প্রথমটি হলো—'লস্ট ইন ট্রান্সলেশন' বা 'তর্জমায় হারিয়ে যাওয়া' ভাব। আমরা জানি, প্রতিটি ভাষার উদ্ভব ও বিকাশের স্থান-কাল ও পরিপ্রেক্ষিত আলাদা ধরনের। ফলে একটি ভাষায় যে ইতিহাস সংস্কৃতির ধারাবাহিকতা থাকে, অন্য ভাষায় সেগুলো অনেকক্ষেত্রেই অনুপস্থিত থেকে যায়। ফলে এক ভাষার 'ভাব' অন্য ভাষায় হারিয়ে যায়—চেতনে কিংবা অবচেতনে। কারণ, অনেক ক্ষেত্রে একটি নির্দিষ্ট ভূখণ্ডের মানুষ একটি নির্দিষ্ট ভাষার 'ঘরেই বাস' করে। আর এই শূন্যস্থান পূরণে অনুবাদককে তার 'টার্গেট' পাঠকের সঙ্গে আরও ভালোভাবে যোগাযোগের জন্য 'ট্রান্সলিটারেশন'-এর আশ্রয় নিতে হয়। অর্থাৎ, মূল লেখায় (ইংরেজি ভাষায়) যা নেই, তা তাকে টার্গেট ভাষা (বাংলা ভাষায়) বোঝাতে গেলে কিছু নতুন বাক্য-শব্দ জুড়ে দিতে হয়, যাতে করে পাঠক মূল টেক্সটের কাছাকাছি স্বাদ পেতে পারেন। এসব কারণেই অনুবাদ করাবেশ ঝুঁকিপূর্ণ একটি কাজ। তবে এর উল্টো দিকে অনুবাদকের আনন্দ হলো—টেক্সট বা লেখাটি তাঁর খুব গভীর উপলব্ধিতে পড়া হয়ে যায়, যা তিনি 'সাধারণ পাঠে' হয়তো পেতেন না। আর কোনো লেখা গভীর উপলব্ধিতে পাঠের ফলে অনুবাদক তথা পাঠকের জীবনের বোধে যেটুকু অমূল্য নির্যাস সঞ্চারিত হয়,তা তার দৃষ্টিভঙ্গিকে আরও ঋদ্ধ করে।

মুখবন্ধ

আমার শৈশবের স্মৃতিগুলোর মধ্যে একটি দৃশ্যের কথা খুব মনে পড়ে। জাহাজের হুইসেলের শব্দে আমি ঘুম থেকে জেগে উঠি। শব্দটি ক্রমে ক্ষীণ থেকে বাড়তে শুরু করে ধীরে ধীরে বিস্ফোরিত হয়ে ছড়িয়ে পড়ছিল। হুইসেলের বিকট চিৎকারে আমার ঘুম ভেঙে যায়। আমার বয়স তখন বছর তিনেক হবে। হঠাৎ

প্রচণ্ড শব্দের কারণে আমি ঘুম থেকে উদ্বেগ নিয়ে উঠে বসি। মা-বাবা আমাকে আশ্বস্ত করলেন যে, চিন্তিত হওয়ার মতো কিছু ঘটেনি। আমরা তখন কলকাতা থেকে বার্মার রেঙ্গুন যাচ্ছি। জাহাজে চেপে বঙ্গোপসাগর পাড়ি দিচ্ছিলাম। তখন আমার বাবা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে রসায়ন বিভাগে শিক্ষকতা করছিলেন। সে সময় তিনি ৩ বছরের জন্য অতিথি (ভিজিটিং) অধ্যাপক হিসেবে নতুন কর্মস্থলে যোগদান করতে বার্মার রেঙ্গুনে মান্দালয় কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে যাচ্ছিলেন। হুইসেলের শব্দে যখন আমি জেগে উঠি, ততক্ষণে আমাদের জাহাজটি কলকাতা থেকে গঙ্গা নদীর মধ্যে দিয়ে ১০০ মাইল পথ পাড়ি দিয়ে ফেলেছে। সেই সময়ে কলকাতা বন্দরেই বড় বড় সব জাহাজ নোঙর করত এবং ছেড়ে যেত। বাবা আমাকে বুঝিয়ে দিলেন যে, আমাদের জাহাজটি এইমাত্র উন্মুক্ত সমুদ্রে প্রবেশ করেছে এবং এভাবে কয়েকদিন চলার পর আমরা বার্মায় রেঙ্গুন বন্দরে পৌঁছে যাব। সমুদ্রযাত্রা কেমন হতে পারে তা নিয়ে এর আগে আমার কোনো ধারণাই ছিল না। মানুষ এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় বিভিন্ন পদ্ধতিতে কীভাবে যাতায়াত করে, সেসম্পর্কেও আমার আগাম কোনো ধারণা ছিল না। কিন্তু তা সত্ত্বেও আমি একটি রোমাঞ্চকর ভ্রমণের অভিজ্ঞতা পেয়েছিলাম—যখন মনে হচ্ছিল—আমার জীবনে এমন সাংঘাতিক কিছু একটা ঘটতে যাচ্ছে, যা আগে ঘটেনি। বঙ্গোপসাগরের স্থির গাঢ় নীল জলরাশিকে মনে হচ্ছিল—আলাদিনের আশ্চর্য চেরাগ থেকে এইমাত্র বেরিয়ে নীল আভা সৃষ্টি করেছে।

আমার শৈশব-স্মৃতির প্রায় পুরোটার উৎস হলো আমাদের পরিবারের বার্মার সময়টা। বার্মায় আমরা বছর তিনেকের কিছু বেশি সময় ছিলাম। সেখানকার কিছু স্মৃতি আমার আজও অম্লান। যেমন মান্দালায়ে খুব সুন্দর রাজপ্রাসাদ দেখার কথা মনে আছে, যার চারপাশটা কমনীয় পরিখা দিয়ে ঘেরা ছিল, ইরাবতী নদীর তীরে দাঁড়িয়ে দিগন্ত প্রসারিত অপরূপ দৃশ্য, আর আমরা শহরের যে প্রান্তেই যাই না কেন সবর্ত্রই ছিল সুন্দর সুন্দর প্যাগোডার ছড়াছড়ি! কিন্তু আমার কমনীয় স্মৃতির মান্দালয়ের সঙ্গে অন্যদের দেখা ধুলোময় মান্দালয় শহরের বর্ণনা নাও মিলতে পারে। এমনকি আমরা যে সনাতন বার্মিজ বাড়িটায় থাকতাম, সেটির সৌন্দর্যের বর্ণনায় যে ভাষার ব্যবহার করেছি, সেটিও কিছুটা বাড়তি মনে হতে পারে—তার প্রতি আমার ভালোবাসার কারণে। আসল কথা হলো, এর চেয়ে বেশি সুখী হওয়ার কথা, তখন আমি ভাবতেই পারতাম না। একদম ছোটবেলা থেকেই আমি ভ্রমণ করছি। বার্মায় আমার ছেলেবেলা কাটানোর পর আমি ঢাকায় ফিরে আসি। ফিরে আসার অল্পকিছুদিন পরই বেশ তাড়াহুড়ো করে ঢাকার স্কুল থেকে শান্তিনিকেতনে ভর্তি হতে হয়। শান্তিনিকেতন ছিল আবাসিক স্কুল। দার্শনিক কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কলকাতায় নতুন ধরনের নীরিক্ষাধর্মী বিদ্যাপীঠ শান্তিনিকেতন গড়ে তোলেন। আমার পারিবারিক জীবন ও আমার জীবনে রবীন্দ্রনাথের প্রভাব সবচেয়ে বেশি। তাঁর প্রভাব আমার ওপর কতখানি তার প্রমাণ হিসেবে আমি বলতে পারি—এই গ্রন্থটির শিরোনামটিই আমি নিয়েছি রবীন্দ্রনাথের বিখ্যাত উপন্যাস "ঘরে-বাইরে" ("দ্য হোম অ্যান্ড দ্য ওয়ার্ল্ড") থেকে উদ্বুদ্ধ হয়ে।

রবীন্দ্রনাথ প্রতিষ্ঠিত শান্তিনিকেতনে চিত্তাকর্ষক ১০ বছরের স্কুলপাঠ শেষে আমি কলকাতায় ফিরে এলাম আমার কলেজ জীবন শুরু করতে। কলেজে আমি বুদ্ধিদীপ্ত শিক্ষকমণ্ডলী ও মেধাদীপ্ত সহপাঠী পেলাম। কলেজের আনুষ্ঠানিক বিদ্যার পরিপূরক হিসেবে কলেজ ভবনের খুব কাছেই বিখ্যাত কফি হাউজ পেয়ে যাই। কফি হাউজের আড্ডা ছিল সমৃদ্ধ আলোচনা ও তর্কবিতর্কে ভরপুর। এবং অবশ্যই সে সময়টি ছিল উত্তেজনাময়। এরপর সেখান থেকে আমি যুক্তরাজ্যের কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে যাই। আবারও জাহাজে করে সমুদ্রযাত্রা। কিন্তু এবার কলকাতা থেকে নয়; বোম্বে সমুদ্রবন্দর থেকে সোজা লন্ডন যাত্রা। ভ্রমণের পুরোটাই ছিল উত্তেজনায় ঠাসা। আমি ভর্তি হই কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রিনিটি কলেজে। ট্রিনিটি কলেজ ও কেমব্রিজ উভয়েরই সমৃদ্ধ ইতিহাস আমাকে এর ভেতরে টেনে নিয়ে গেছে।

এরপর আমার সুযোগ আসে আটলান্টিকের অপর পাড়ে যুক্তরাষ্ট্রে এক বছরের জন্যে পড়ানোর। এই এক বছরে আমি বোস্টনের কেমব্রিজের ম্যসাচুসেস্টস ইনস্টিটিটিট অব টেকনোলজি (এমআইটি) ও ক্যালিফোর্নিয়ার স্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়িয়েছি। বছর শেষে ভারতে ফেরার আগে আমি বিভিন্ন জায়গায় আমার শেকড় রাখার চেষ্টা করেছি। যেমন পাকিস্তানের লাহোর ও করাচি বিশ্ববিদ্যালয়েও আমি কাজ করেছি। ভারতে ফিরে এসে আমি দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দিই। এখানে পড়ানোর সময় আমি অর্থশাস্ত্র, দর্শন, গেম থিওরি, গাণিতিক যুক্তিবিদ্যা এবং তুলনামূলকভাবে কিছুটা নতুন বিষয়—সামাজিক চয়ন তত্ত্ব কোর্স দিই। তরুণ শিক্ষক হিসেবে সুখী দিন অতিবাহিত করার মধ্যে দিয়ে আমার জীবনের প্রারম্ভিক তিন দশক সমাপ্ত হয়। আমার প্রত্যাশা ছিল জীবনের পরবর্তী পর্বগুলো হবে নতুন অভিজ্ঞতায় পরিপূর্ণ এবং আরও পরিণত পর্যায়ে জীবনকে নিয়ে যাওয়ার অধ্যায়।

দিল্লিতে থিতু হওয়ার পর আমি আমার জীবনের ফেলে আসা দিনগুলোর দিকে ফিরে তাকানোর সময় পাই। আমার নিজের জীবনকে তখন নানা ধরনের অভিজ্ঞতায় ভরপুর মনে হয়। আমি তখন বুঝতে পারি যে, পৃথিবীর সভ্যতা ব্যাখ্যায় দুটি ভিন্ন ধরনের দৃষ্টিভঙ্গি রয়েছে। একটি ধারার দৃষ্টিভঙ্গি হলো 'খণ্ডিত'। এই দৃষ্টিকোণটির আওতায় বিভিন্ন সময়ের সভ্যতার বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য ও তার প্রকাশভঙ্গিগুলো আলাদা আলাদা সভ্যতা হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। এই ধারার ব্যাখ্যায় বিভিন্ন সময়ের সভ্যতার অংশগুলোর মধ্যে প্রতিকূল সম্পর্ক দেখানো হয়। বর্তমান সময়ে এই দৃষ্টিভঙ্গিটি বেশ প্রচলিত, যেটি 'সভ্যতার সংঘাত' নামে আমাদের সামনে আত্মপ্রকাশ করেছে।

আর অন্য ধারাটি হলো 'অন্তর্ভুক্তিমূলক' দৃষ্টিভঙ্গি। এই দৃষ্টিকোণের আগ্রহ হলো বিভিন্ন সভ্যতার বৈশিষ্ট্য ও প্রকাশভঙ্গিগুলো চূড়ান্তভাবে একটি সভ্যতার অঙ্গ হিসেবে চিহ্নিত করা। এটিকে বিশ্বসভ্যতা নাম দেওয়া যায়। এই বিশ্বসভ্যতার গাছটি সৃষ্টি হয়েছে সমগ্র মানবজাতির পরস্পরসম্পর্কিত আন্তজীবন যাপনের মাধ্যমে—বিভিন্ন জায়গায় সে তার শেকড় ও শাখা-প্রশাখা ছড়িয়ে দিয়ে নানা ধরনের বৈচিত্র্যময় ফুল ফুটিয়েছে। নিশ্চিতভাবেই, আমার এ গ্রন্থটি যদিও সভ্যতার প্রকৃতির যুক্তিসিদ্ধ অনুসন্ধানে নিবেদিত নয়, কিন্তু পাঠক হিসেবে আপনি দেখবেন যে, পৃথিবীর যা-কিছু অবদান তার ব্যাখ্যায় খণ্ডিত দৃষ্টিভঙ্গির চেয়ে বরং সভ্যতার অন্তর্ভুক্তিমূলক দৃষ্টিভঙ্গির প্রতি আমার সহমর্মিতা রয়েছে।

মধ্যযুগের ক্রুসেড থেকে শুরু করে বিগত শতকের নাৎসিদের আক্রমণ, ধর্মীয় রাজনীতির যুদ্ধ-বৈরীতার অবস্থা থেকে সাম্প্রদায়িক হিংস্রতা ও দাঙ্গার সৃষ্টি, বিভিন্ন ধরনের গোঁড়া মতের গোষ্ঠীগুলোর ভেতর রেষারেষি ও ঝগড়া— এসব হিংসা ও সংঘাত থাকা সত্ত্বেও এর বিরুদ্ধে সভ্যতাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করার শক্তিশালী ধারাও বহমান ছিল। আমরা যদি ভালোভাবে লক্ষ করি, তবে বুঝতে পারব—একটি গোষ্ঠী থেকে অন্য গোষ্ঠীতে কীভাবে জ্ঞান সঞ্চারিত হয় এবং এক দেশ থেকে অন্য আরেকটি দেশে বুদ্ধিবৃত্তি ও সংস্কৃতির আদান-প্রদান ঘটে। সভ্যতার এই পারস্পরিক বিনিময়ের পথ ধরে হাঁটতে থাকলে আমরা দেখব যে, বৃহত্তর ও সমন্বিত দৃষ্টিভঙ্গির কাহিনীগুলো আমরা কিছুতেই এড়াতে পারছি না। পারস্পরিক সম্পর্কের ভেতর দিয়ে জ্ঞান আহরণের মাধ্যমে আমাদের সক্ষমতাকে বাড়িয়ে তোলার গুরুত্বকে কিছুতেই খাটো করে দেখা যায় না।

চিন্তাশীল সত্তা হিসেবে মানুষ হলো গঠনমূলক অভিজ্ঞতার বিশাল এক ভান্ডার। এক হাজার বছর আগে, প্রথম সহস্রাব্দের শেষ দিকে এবং ১১ শতকের প্রথম দিকে ইরানী গণিতজ্ঞ আল-বেরুনি বেশ কিছু বছর ভারতে ছিলেন। আল-বেরুনির সুলিখিত "তারিখ আল-হিন্দ" গ্রন্থের এক জায়গায় তিনি মন্তব্য করেন যে,

পরস্পরের কাছ থেকে শেখার বিষয়টি সমৃদ্ধ জ্ঞান ও সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠার পক্ষে কতটা সহায়ক হিসেবে কাজ করেছে। তিনি ভারতে থেকেই গণিতশাস্ত্র, জ্যোতির্বিদ্যা, সমাজবিজ্ঞান, দর্শন ও চিকিৎসাশাস্ত্রে চমৎকার সব অবদান রেখে গেছেন। সেটি কম দিনের কথা নয়, আজ থেকে প্রায় এক সহস্রাব্দ বছর আগেই তিনি দেখিয়েছেন যে, পারস্পরিক বন্ধুত্বের ভেতর দিয়ে কীভাবে জ্ঞানের পরিধি বাড়িয়ে তোলা যায়। ভারতীয়দের প্রতি আল-বেরুনির ভালোবাসা ভারতীয় গণিতশাস্ত্র ও বিজ্ঞানে তাঁর আগ্রহ একদিকে যেমন বাড়িয়ে তুলেছে, ঠিক তেমনই এটাই ভারতীয় এসব শাস্ত্রে তাঁর নিজের সক্ষমতা বৃদ্ধির কারণ। যা হোক, অবশ্য তাঁর এই মুগ্ধতা ভারতীয় বিদ্যাশাস্ত্র নিয়ে খানিকটা ঠাট্টায় বাধা হতে পারেনি। বেরুনির মতে, ভারতীয় গণিতশাস্ত্র অসাধারণ পাণ্ডিত্যপূর্ণ, কিন্তু ভারতীয় পণ্ডিতদের অধিকাংশের ভেতরই কিছুটা ভিন্ন অস্বাভাবিক ক্ষমতা রয়েছে। তাঁরা অসাধারণ বাক্‌পটু—এমনকি কোনো বিষয় সম্পর্কে তাঁদের বিন্দুমাত্র ধারণা না থাকলেও তাঁরা সে বিষয়ে অনর্গল আলাপ চালিয়ে যেতে সক্ষম!

আমার মধ্যে সেই গুণাগুণ যদি থেকে থাকে, তবে কি আমার তাতে গর্বিত হওয়া উচিত? আমি ঠিক জানি না।তবে আমার মনে হয়, আমি যা জানি তা দিয়েই আমার নিজের কথা শুরু হতে পারে। আমার এই আত্মজীবনীটি এই জানার চেষ্টারই একটি ক্ষুদ্র প্রয়াশ; কিংবা ন্যূনতম আমার জীবনে যেসব অভিজ্ঞতা হয়েছে—সেগুলোই এখানে আমি বলবার চেষ্টা করেছি। অবশ্য তাতে এটি বলা যায় না যে, আমি আসলেই সেসব বিষয় সম্পর্কে খুব জানি।

ঢাকা ও মান্দালয়

"কোন বাড়িটিকে আপনার নিজের ঘর বলে মনে করেন?" আমার দিকে এই প্রশ্নটি করলেন লন্ডনের বিবিসির কার্যালয়ের সাক্ষাৎকার গ্রহণকারী। আমরা দুজনেই সে সময়ে আমাদের একটি আলাপচারিতা ধারণ করার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলাম। তিনি আমার একধরনের জীবনচরিত জানার জন্য এই প্রশ্নটি ছুড়ে দিলেন। তিনি বললেন, 'এই কিছুদিন আগে আপনিযুক্তরাষ্ট্রের কেমব্রিজের হার্ভার্ড থেকে যুক্তরাজ্যের কেমব্রিজে ফিরলেন। অর্থাৎ হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রিনিটি কলেজে ফিরে এলেন। আপনি যুক্তরাজ্যে কয়েক দশক ধরে বসবাস করলেও আপনার নাগরিকত্ব ভারতীয়। আমি অনুমান করি, আপনার পাসপোর্টটি ভিসায় একেবারে ভরে গেছে। সুতরাং বলুন তো মশাই আসলে আপনার ঘর কোনটি?" ঘটনাটি ১৯৯৮ সালের। আমি কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রিনিটি কলেজের অধ্যক্ষ (মাস্টার) হিসেবে মাত্রই ফিরে এসেছি। আমার এই যোগদানই এই সাক্ষাৎকারের উপলক্ষ তৈরি করেছে। তার প্রশ্নের জবাবে আমি বললাম, 'এই মুহূর্তে এ জায়গাটিকেই আমার আরামদায়ক ঘর মনে হচ্ছে।' কেন এ রকমটি আমি মনে করছি, তার কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে যুক্তরাজের সঙ্গে আমার অতীত সম্পর্ক ধারাবাহিকভাবে তাকে ব্যাখ্যা করলাম। আমি তাকে বললাম, দেখুন, আমি মাত্র ১৯ বছর বয়সে (যুক্তরাজ্যের কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের) ট্রিনিটি কলেজে অনার্সের ছাত্র হিসেবে পড়তে আসি। এরপর একজন গবেষক ছাত্র হিসেবে, পরে ফেলো গবেষক পদে এবং আরও পরে এই কলেজেই শিক্ষক হিসেবে পড়াতে শুরু করি। এ কথার সঙ্গে আমি আরও যোগ করি—কিন্তু তা সত্ত্বেও কিছুকাল আগে আমি যুক্তরাষ্ট্রের বোস্টন অঙ্গরাজ্যে কেমব্রিজ শহরের হার্ভার্ড স্কয়ারের কাছে আমার যে পুরোনো বাড়ি রয়েছে, সেটিও আমার কাছে একইরকম আরামদায়ক ঘর মনে হয়। শুধু তা-ই নয়, ভারতেও আমার থাকতে খুব ভালো লাগে, বিশেষ করে শান্তিনিকেতনে আমাদের যে ছোট্ট বাড়িটি রয়েছে, শৈশবে যেখান আমি বড় হয়েছি এবং এখনো আমি বছরের একটি অংশ সেই বাড়িতে কাটাতে ভালোবাসি।

আমার এমন অপ্রচলিত জবাব শুনে বিবিসির লোকটি আমার দিকে তাকিয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন যে, 'তাহলে তো বাড়ির অর্থ সম্পর্কে আপনার কোনো ধারণাই নেই দেখছি!' তার কথার প্রত্যুত্তরে আমি বললাম, 'আমার একাধিক আরামদায়ক ঘর রয়েছে; কিন্তু ঘর বলতে কোনো একটি নির্দিষ্ট স্থানে কেবল একটি ঘরই থাকতে হবে আপনার এমন ধারণা আমি সহভাগ করে নিতে পারছি না।' বিবিসির লোকটির কাছে আমার উত্তরটি মনঃপূত হলো না।

ঘরের ধারণা নিয়ে কাছাকাছি ধরনের ধাক্কা খাওয়ার অভিজ্ঞতা আমার আরও হয়েছে। বিশেষ করে, ব্যক্তিপরিচিতির সঙ্গে যারা একটি সুনির্দিষ্ট স্থানের সম্পর্কের ভাবনাটি অনমনীয়ভাবে মাথায় রেখে চলেন, তাদের সঙ্গে আমার এধরনের অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হতে হয়েছে। আমার কথায় তৃপ্তি না পেয়ে, তারা আমায় জিজ্ঞেস করে, 'আমার প্রিয় খাবার কোনটা?' আমার দিক থেকে এরও উত্তর একটি নয়, একাধিক। আমার পছন্দের খাবারগুলোর মধ্যে আমি প্রথমেই বেছে নেব *ত্যাগলিওনি কন ভনগলে* অথবা *শেজওয়ান হাঁস*, এবং অবশ্যই আমার প্রিয় ইলিশ মাছ বেছে নেব। তবে ইলিশটি যদি ঝোল করে রান্না হয় তাহলে তো আর কথাই নেই। প্রিয় খাবার সম্পর্কে এটুকু বলেই আমি থেমে যেতে পারি না। আমার পছন্দের ব্যাপারটি বুঝিয়ে বলতে যোগ করি যে, তবে ইলিশটি কিন্তু রান্না হতে হবে ঢাকাইয়া (পুরান ঢাকার) রীতিতে সর্ষে বাটা দিয়ে। আমার এমন জবাব শুনে প্রশ্নকর্তার খটকা কাটে না। আমাকে জিজ্ঞেস করেন, 'বুঝলাম, কিন্তু এগুলোর মধ্যে আসলেই কোনটি আপনার সত্যি সত্যিই প্রিয় খাবার?' তার প্রশ্ন শুনে মনে হলো, আমার উত্তরটি প্রশ্নকর্তাকে তৃপ্ত করতে পারেনি।

এমন প্রশ্নের প্রত্যুত্তরে আমি তাকে বলি যে, 'এগুলো সবই আমার অত্যন্ত প্রিয় খাবার, কিন্তু এগুলোর মধ্যে কোনো একটিমাত্র খাবারকে আমি বেছে নিয়ে বাকিগুলো বাদ দিতে পারছি না।' প্রায়ই আমার কথোপকথনের সঙ্গী তার সহজ প্রশ্নের এমন উত্তর প্রসন্নচিত্তে গ্রহণ করতে পারেন না। যা হোক, সৌভাগ্যবশত কখনো কখনো আমার প্রিয় খাবারের আলোচনা শুনে সাক্ষাৎকার গ্রহণকারী সম্মতিসূচক মাথা নাড়লেও 'ঘরে'র প্রশ্নের মতো জরুরি বিষয়ে কারও মধ্যেই আমি এতটুকু ভাবান্তর দেখিনি। তারা বলতে চান যে, 'বুঝলাম, কিন্তু সত্যি সত্যিই আপনার একটি নির্দিষ্ট ঘর থাকার কথা, যেখানে আপনি প্রশান্তি অনুভব করেন, সেটি কোনটি?'

দুই.

বসবাসের ক্ষেত্রে মানুষ কেন একটিমাত্র জায়গা নিয়েই আগ্রহী হয়? এমনও হতে পারে যে, আমি বিনা বাধায় একাধিক স্থানে সমান আরামবোধ করি। সনাতন বাঙালি সংস্কৃতিতে 'আপনার দেশের বাড়ি কোথায়?' এ প্রশ্নটির সুনির্দিষ্ট অর্থ আছে, যেটি আবার ইংরেজি ভাষাভাষী মানুষদের বোধ থেকে বেশ আলাদা। বাংলা ভাষায় 'ঘর' কিংবা 'বাটি' শব্দটি দিয়ে বোঝায় যে, আপনার পরিবার (পূর্বপুরুষ) কোন স্থান থেকে আগত। অর্থাৎ সেই ব্যক্তির পূর্বপুরুষদের জন্মস্থান কোথায় ছিল? যদিও সেই মানুষটি বা তার নিকটপ্রজন্ম সেখানে আর থাকেন না। তারা বর্তমানে অন্যত্র বসবাস করছেন। বংশসূত্রের সঙ্গে বিশেষ স্থানের সম্পর্ক শুধু বাঙালিদের মধ্যে নয়, সমগ্র ভারতীয় উপমহাদেশে বসবাসকারী অন্য জাতিগোষ্ঠীর ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। কিন্তু ইংরেজি ভাষায় কথপোকথনে অনেক সময় ঘরের এই স্থানভিত্তিক অর্থ কিছুটা বদলে যায়। একারণে ভারতীয়-ইংরেজি ভাষায় কথাটি এভাবে চলে আসে: 'আপনি কোথা থেকে এসেছেন?' হতে পারে আপনি এখন যে 'ঘরে' বসবাস করছেন, সেটি আপনার পূর্বপুরুষের প্রাণপ্রিয় জন্মস্থান থেকে বহুদূরে।

আমার জন্মের সময়, আমার পরিবার ঢাকা শহরের বাসিন্দা হলেও আমার জন্ম কিন্তু ঢাকায় নয়। ১৯৩৩ সালের শরৎ কালের শেষ দিকে আমার জন্ম। পরে আমি জেনেছি, সেই সময়টায় ইউরোপে মহামন্দার কারণে প্রচুর মানুষের জীবন ও বসতি ভয়াবহ বিপর্যয়ের মধ্যে পড়েছিল। কমপক্ষে ৬০ হাজার লেখক, কারিগর, বিজ্ঞানী, সঙ্গীতজ্ঞ, অভিনেতা ও চিত্রশিল্পী জার্মানি থেকে ইউরোপের বিভিন্ন দেশ ও আমেরিকাতে অভিবাসিত হতে বাধ্য হয়। অল্প কিছুসংখ্যক অভিবাসী, মূলত ইহুদীরা সেখান থেকে ভারতে চলে আসে। আজকের বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকার বিশাল ব্যাপ্তি, প্রাণচাঞ্চল্য এবং কিছুটা অবাক বিস্ময়ের শহর হিসেবে আত্মপ্রকাশের আগে, তখনকার ঢাকা ছিল অনেকটা কোলাহলমুক্ত, শান্ত ও ছোট্ট শহর, যেখানে মানুষের জীবন সহমর্মিতার বোধ নিয়ে ধীরলয়ে এগিয়ে চলত। আমরা থাকতাম ঐতিহাসিক পুরান ঢাকার ওয়ারীতে। ওয়ারী এলাকাটি ছিল রমনায়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সেটি বেশি দূরে নয়। আমার বাবা আশুতোষ সেন এই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়ণ বিভাগে পড়াতেন। আমি অবশ্য পুরান ঢাকার কথাই বলছি, কিন্তু বর্তমানের আধুনিক ঢাকা সেখান থেকে ১০ মাইলেরও বেশি বিস্তৃত হয়েছে।

আমার পিতামাতা ঢাকায় থাকতে ভালোবাসতেন। অতএব আমি ও আমার ছোটবোন মঞ্জুও (ভালো নাম সুপূর্ণা) ঢাকাকে ভালোবাসতাম। মঞ্জু বয়সে আমার থেকে চার বছরের ছোট। আমাদের পুরান ঢাকার বাড়িটি তৈরি করেন আমার দাদা সারদা প্রসাদ সেন। তিনি ঢাকা কোর্টে বিচারক ছিলেন। আমার দাদার বড় সন্তান ছিলেন জিতেন্দ্র প্রসাদ সেন। তিনি আমার বাবার থেকে বয়সে বড়। বড় চাচা জিতেন্দ্র প্রসাদ সেন কাদাচিৎ ঢাকায় থাকতেন। কারণ, সরকারি চাকরিসূত্রে বৃহত্তর বাংলার বিভিন্ন জায়গায় বদলি হওয়াতে তাকে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন জায়গায় থাকতে হতো। কিন্তু ছুটিতে যখন বড় চাচা আমাদের পুরান ঢাকার যৌথপরিবারের বাড়িতে ফিরতেন, সেই সময়টি ছিল আমার ছেলেবেলার সবচেয়ে আনন্দঘন মুহূর্ত। বিশেষ করে আমার বড় চাচার মেয়ে মীরাদিদির কথা বলতে হবে। বয়সে সে ছিল আমার সমান। আমার আরও চাচাতো ভাইবোন ছিল, যারা ঢাকাতেই থাকত। যেমন চিনিকাকা, ছোটকাকা, মেজ দাদা, বাবুয়া এবং আরও কিছু আত্মীয়। পরিবারের সবার আদর-ভালোবাসা পেয়ে আমি আর মঞ্জু কিছুটা বখেই গিয়েছিলাম বলতে হবে।

আমার অভিবাসী বড় চাচার জ্যেষ্ঠ সন্তান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ত এবং ঢাকায় আমাদের সঙ্গেই থাকত। তার নাম ছিল বসু, কিন্তু আমি তাকে দাদামণি বলতাম। আমার কাছে সে ছিল প্রজ্ঞার এক সমৃদ্ধ ভাণ্ডার। তার সঙ্গটি ছিল আমার কাছে অত্যন্ত উপভোগ্য ও আনন্দের। তিনি ছোটদের সিনেমা দেখাতে ভালোবাসতেন। আমার মনে পড়ে, তার সঙ্গেই আমি অসাধারণ সব সিনেমা দেখেছিলাম। তার উদ্যোগের কারণেই আমি বুঝতে পারি আমার চেনাজানা জগতের বাইরের এক 'বাস্তব পৃথিবী', যা আমার কাছে ধরা পড়েছিল "দ্য থিফ অব বাগদাদ"-এর মতো সিনেমা দেখে।

ছোটবেলার স্মৃতিগুলোর মধ্যে খুব মনে পড়ে আমার বাবার কর্মস্থল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়ণ বিভাগের পরীক্ষাগারের কথা। সেই পরীক্ষাগারে আমি প্রচণ্ড উত্তেজনার সঙ্গে লক্ষ করতাম যে ল্যাবের একটি পরীক্ষায় একধরনের তরল পদার্থ টেস্টটিউবের মধ্যে অন্য দ্রবণের মধ্যে ঢালার ফলে অপ্রত্যাশিতভাবে সম্পূর্ণ নতুন একটি যৌগের সৃষ্টি হচ্ছে। ল্যাবে আমার বাবার একজন সহকারী ছিলেন, যার নাম ছিল করিম। তিনিই আমাকে এসব অত্যাশ্চর্য্য পরীক্ষণগুলো দেখাতেন। এসব দেখে আমি ভাবতাম, তার করা পরীক্ষণগুলো সবসময়ই বোধহয় এমন চমৎকার ফলাফল উপহার দেবে।

আমার জীবনে এমন সুখস্মৃতির কাল আবার ফিরে আসে ১২ বছর বয়সে। বাংলা ভাষার আদি উৎস সংস্কৃত ভাষা রপ্ত করতে পারা আমার জন্য অত্যন্ত গৌরবের। কিন্তু যখন আমি প্রথমবারের মতো সংস্কৃত পড়তে শুরু করি, তখন ভারতীয় বস্তুবাদী চিন্তাধারার সঙ্গে আমার পরিচয় ঘটে। ভারতে বস্তুবাদী ভাবনার ভিত্তি ছিল লোকায়ত দর্শন। আর এই লোকায়ত দর্শনের ভিত্তিতেই সংস্কৃত ভাষার প্রাণরসায়ন তত্ত্ব সৃষ্টি হয়। ভারতে লোকায়ত দর্শন গড়ে ওঠে খৃষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে। সেখানে বলা হয় যে, 'দৃশ্যমান এসব পদার্থগুলো যখন নির্দিষ্ট অবয়বে রূপান্তরিত হবে, তখনই বুদ্ধিবৃত্তির জন্ম হবে। কারণ, বুদ্ধিসৃষ্টির উৎস হিসেবে বস্তুগুলোর মিশ্রণে এসবের ভেতরকার উপাদানগুলো নতুন ক্ষমতা সৃষ্টির উদ্দীপনায় বের হয়ে আসে। আর যদি উপাদানগুলো ধ্বংস হয়ে যায়, তাহলে সঙ্গে সঙ্গে বুদ্ধিবৃত্তিক ক্ষমতাও লোপ পেয়ে যাবে।' এই উদ্ধৃতিটি পড়ে তখন আমার মনটা খুব খারাপ হয়ে গিয়েছিল; কারণ, আমি আমার জীবনে রসায়নের চেয়েও বেশি কিছু আশা করেছিলাম। আরও অনেক পরে—আমার বেড়ে ওঠার পর, জীবনসম্পর্কিত নানা তত্ত্ব জানার পর—আমার ছেলেবেলার সেই স্মৃতিময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়ন পরীক্ষাগার এবং করিমের সেই স্নেহময় প্রদর্শনী আমার জীবনে আবার ভূতুড়েভাবে ফিরে এলেও সেটি ছিল অত্যন্ত প্রাণবন্ত।

আমি জানতাম আমি ঢাকারই ছেলে। কিন্তু অন্যসব শহুরে ছেলেমেয়ের মতোই আমিও আসলে গ্রামের বাড়ি থেকেই ঢাকা শহরে এসে উঠেছি 'মত্ত' নামের ছোট্ট একটি গ্রাম থেকে। এটি মানিকগঞ্জ জেলার একটি গ্রাম। ঢাকা শহর থেকে মানিকগঞ্জ কিন্তু খুব বেশি দূরে নয়। কিন্তু আমার ছেলেবেলায় সেখানে যেতে প্রায় আস্ত একটা দিন লেগে যেত। সেখানে যাওয়ার বেশিরভাগ পথই পাড়ি দিতে হতো বিভিন্ন নদ-নদীর সর্পিল পথ ধরে, নৌকায় করে। এখনকার সময়ে ঢাকা থেকে মত্তে যেতে লাগে মাত্র কয়েক ঘণ্টা, আর যেতেও তেমন কষ্ট নেই। কারণ, সেখানে ভালো মানের প্রশস্ত রাস্তা হয়েছে। সেই সময়ে আমরা বছরে একবার দাদাবাড়ি যেতাম, তাও মাত্র কয়েক সপ্তাহের জন্য। সেখানে যাওয়ার ফলে আমি মনে খুব প্রশান্তি অনুভব করতাম। তখন মনে হতো, আমি আমার ঘরে ফিরে এসেছি। মত্ত গ্রামে আমার খেলার সাথী আরও যেসব ছেলেমেয়ে ছিল, তারাও দূর-দূরান্তের কোনো না কোনো শহর থেকে নানা উৎসব-পার্বণ উপলক্ষে গ্রামের বাড়িতে আসত। সেসময়ে তাদের সঙ্গে আমার ভালো বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে, যদিও সে সম্পর্কগুলো ছিল ক্ষণকালের। শহরে ফেরার সময় হলে প্রতিবছরই তাদের মন খারাপ করে বিদায় জানাতে হতো।

তিন.

আমাদের পুরান ঢাকার বাড়িটির নাম ছিল 'জগৎ কুটির'। জগৎ কুটির বলতে বোঝায় 'পৃথিবীর ঘর'। বাড়ির এমন নামকরণের পেছনে আমার দাদার জাতীয়তাবাদের প্রতি তার কিছুটা সংশয়ী মনের প্রকাশ রয়েছে। যদিও আমাদের পরিবার ব্রিটিশরাজের বিরুদ্ধে কিছু সংগ্রামী জাতীয়তাবাদীর জন্ম দিয়েছে (এবিষয়ে আমি পরে বিস্তারিত বলব)। কিন্তু বাড়ির নামকরণের পেছনে আরও একটি অনুভব কাজ করেছে। আমার দাদার প্রাণপ্রিয় স্ত্রী অর্থাৎ আমার প্রয়াত দাদির নাম ছিল জগৎলক্ষ্মী (এটি সংস্কৃত ভাষারও শব্দ)। সুতরাং জগৎ কুটিরের অর্থ দাঁড়ায় আমার দাদি জগৎ-এর কুটির বা ঘর। আমি তাকে কখনো দেখিনি। কারণ, আমার জন্মের অনেক আগেই তিনি প্রয়াত হন। কিন্তু আমার দাদি জগৎলক্ষ্মীর শূন্যতায়ও তাঁর সত্তার বিশেষ উপস্থিতি আমাদের আবিষ্ট করে রাখত। কারণ, তিনি জীবনযাপনে যে প্রজ্ঞার চর্চা রেখে গিয়েছিলেন, সেটি আমাদের পরিবারের সব সদস্যের যাপিত জীবন বিপুলভাবে প্রভাবিত করত। এমনকি আমি এখনো মাঝেমধ্যে হেঁচকি উঠলে তাঁর শেখানো দাওয়াইটিই গ্রহণ করি। আমার

দাদির দাওয়াইটি খুব সোজা। এক গ্লাস ঠান্ডা জলে কয়েক চামচ চিনি মিশিয়ে ধীরে ধীরে চুমুক দিয়ে দ্রবণটি খাওয়া। ঘটনাক্রমে যদি আপনার কখনো হেঁচকি ওঠে, তাহলে শ্বাস-প্রশ্বাসের সময় কিছুক্ষণ পর পর হিক্কার কষ্ট থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য এ পদ্ধতি অনুসরণ করলে সমস্যাটি থেকে আপনি খুব আরামেই বেরিয়ে আসতে পারবেন।

যদিও আমার বাবা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করতেন, কিন্তু তাঁর বাবা, মানে আমার দাদা সারদা প্রসাদ সেন ছিলেন আদালতের বিচারক। কিন্তু তাসত্ত্বেও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল, বিশেষ করে বিশ্ববিদ্যালয়টির আইনি ও আর্থিক বিষয়সংক্রান্ত কর্মকাণ্ডে। আমাদের বাড়িটি বিশ্ববিদ্যালয়ের লোকজনের পদচারণে সবসময় মুখর থাকত। দাদার কাছে আসা এসব দর্শনার্থীর কাছ থেকে আমি জানতে পেরেছি, তারা কত দূরদূরান্ত থেকে দাদার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন। কিছু কিছু জায়গা অবশ্য তাদের কাছে বেশি দূর মনে হতো না। তখনকার সেসব স্থানের মধ্যে উপমহাদেশ ও তৎসংলগ্ন বিভিন্ন জায়গা ছিল: কলকাতা ও দিল্লী তো ছিলই; এর সঙ্গে বোম্বে থেকেও মানষজন আসত, এমনকি হংকং ও কুয়ালালামপুর থেকেও লোকজন দেখা করতে দাদার কাছে আসত। কিন্তু আমার সেই ছেলেবেলার কল্পনায় এসব স্থানের সমষ্টিকেই আমি সমগ্র পৃথিবী বলে ভাবতাম। বাড়ির ছাদে সুগন্ধী চম্পা ফুলের গাছের ছায়ায় বসতে আমার ভীষণ ভালো লাগত। সেখানে বসেই আমি অতিথিদের কাছ থেকে তাদের দূরের ভ্রমণের রোমাঞ্চকর সব অভিজ্ঞতার গল্প উপভোগ করতাম এবং এসব শুনে আমি ভাবতাম যে এধরনের রোমঞ্চকর ভ্রমণের অভিজ্ঞতা আমার জীবনেও আসবে।

আমার মায়ের নাম অমিতা। কিন্তু বিয়ের পর তার নামের শেষাংশ পরিবর্তনের কোনো প্রয়োজনই পড়েনি। কারণ, আমার নানা ছিলেন সংস্কৃত ভাষা ও ভারতীয় দর্শনে খুব নামকরা পণ্ডিত। আমার নানার নাম ছিল ক্ষিতিমোহন সেন। কিন্তু আমার বাবা-মা দুজনেরই বংশের নাম একই 'সেন' হওয়ায় আজও আমার নিজের নামের শেষাংশের পরিচিতির নির্দিষ্ট উৎস নিয়ে ঝামেলায় পড়তে হয় আমাকে। আমার ছাত্রছাত্রীদের অভিভাবকেরা– যারা নিরাপদ যোগাযোগে অভ্যস্ত, তারা যখন আমার বংশপরিচয়ের বিষয়টি খুঁটিয়ে পরীক্ষা করেন বিশেষত আমার নানার বংশের পরিচিতি, তখন আমাকে জিজ্ঞাসা করলে জবাবে আমি বলি, 'না, না, আমিআমার মায়ের মূল নাম এটাই।'

আমার নানা ক্ষিতিমোহন পড়াতেন শান্তিনিকেতনে। বর্তমানে শান্তিনিকেতন ভারতের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের অন্তর্গত। শান্তিনিকেতন এখন বিশ্বভারতী বিদ্যাপীঠের অন্তর্গত একটি প্রতিষ্ঠান। বিশ্বভারতী নামের ভেতর বিশ্ব শব্দের অর্থ হলো সমগ্র বিশ্বকে অঙ্গীভূত করে বুঝবার অনুপ্রেরণা সৃষ্টি করা। আর ভারতীয় শব্দ দিয়ে বোঝানো হয়েছে যে এই বিদ্যাপীঠটি সমগ্র পৃথিবীকে একক সত্তা হিসেবে দেখার প্রজ্ঞা সৃষ্টি করবে। যদিও বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠানটি শান্তিনিকেতনের মতো গুণী প্রতিষ্ঠানকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে, তা সত্ত্বেও উচ্চতর গবেষণায়ও এটি তার পরিধি বাড়িয়েছে, যার জন্য সুনাম আরও ছড়িয়ে পড়েছে। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠা করেন ১৯০১ সালে। এই প্রতিষ্ঠান গড়তে ক্ষিতিমোহন কেবল রবীন্দ্রনাথকে সাহায্য-সহযোগিতার হাতই বাড়িয়ে দেননি, বরং বিদ্যাপীঠ হিসেবে বিশ্বভারতীর নিজস্ব বিদ্যাচর্চার আদল সৃষ্টিতেও তিনি অবদান রেখেছেন। কেবল ক্ষিতিমোহনের দ্বারাই সেটি সম্ভব হয়েছিল; কারণ, পণ্ডিত হিসেবে তাঁর নিজের খ্যাতি এবং বিভিন্ন ভাষায় তাঁর সুলিখিত গ্রন্থগুলো বেশ সমীহ জাগিয়েছিল। বহুভাষাবিদ ক্ষিতিমোহনের বইগুলোর মধ্যে যেমন সংস্কৃত ভাষায় লিখিত বই ছিল, ঠিক তেমনি বাংলা, হিন্দি ও গুজরাটি ভাষায় বেশ কিছু গ্রন্থ তিনি রচনা করে গেছেন।

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে আমার মায়ের পরিবারের সবারই ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। আমার মা অমিতা ছিলেন একজন দক্ষ নৃত্যশিল্পী। মা নৃত্যে নতুন রীতি রপ্ত করেছিলেন। এই রীতিটি আবিষ্কারে রবীন্দ্রনাথের ভূমিকা ছিল। বর্তমানে এই নৃত্যরীতিকে 'আধুনিক নৃত্যকলা' বলা হলেও সে সময়ের প্রেক্ষাপটে বড় বেশি আধুনিক মনে করা হতো। রবীন্দ্রনাথ রচিত নৃত্যনাটকগুলোর অনেকগুলোতেই মা প্রধান নারী নৃত্যশিল্পী হিসেবে কলকাতার প্রদর্শনীগুলোতে অংশ নিয়েছিলেন। সে সময় অবশ্য 'সম্ভ্রান্ত ঘরের' মেয়েদের মঞ্চে ওঠা প্রচলিত ছিল না। আমার মা শান্তিনিকেতনে থাকতে জুডোও শিখেছিলেন, যেটি তখনকার সময়ের মেয়েদের মধ্যে শেখার চল ছিল না। নারী শিক্ষার্থীদের বিকাশে অবারিত এ চর্চার বিষয়টি রবীন্দ্রনাথের বিদ্যাপীঠ সম্পর্কে আমাদের এমন একটি ধারণা দেয়, যা আজ থেকে ১০০ বছর আগেই তিনি আমাদের দেখিয়ে গেছেন।

আমি জেনেছিলাম যে আমার বাবা-মায়ের বিয়ের যখন কথাবার্তা চলছিল, তখন আব্বা আমার মা সম্পর্কে খুব উচ্চ ধারণা রাখতেন। আব্বার এমন বোধের কারণ হলো, আমার মা অমিতা মধ্যবিত্ত সমাজের প্রথম নারী, যিনি মঞ্চে নৃত্যশিল্পী হিসেবে অত্যন্ত মর্যাদাবান ও সমৃদ্ধ নৃত্যনাট্যে নাচের পারফরমেন্স শৈল্পিকভাবে উপস্থাপন করেন। আম্মার সেসব অনুষ্ঠানের খবর সংবাদপত্রগুলোয় প্রকাশিত হলে,তার পেপার কাটিং আব্বা সংরক্ষণ করতেন। আম্মার সেসব চমৎকার শৈল্পিক উপস্থাপনা নিয়ে কাগজগুলোর উচ্চ প্রশংসার অংশগুলো যেমন আব্বা আনন্দচিত্তে সংরক্ষণ করতেন, আবার ঠিক তেমনি জনসমক্ষে মেয়েদের নাচের বিষয়ে অপ্রশস্ত দৃষ্টিভঙ্গির লোকদের সমালোচনার পেপার কাটিংও কেটে রাখতেন। নৃত্যশিল্পী হিসেবে অমিতার শৈল্পিক দক্ষতা ছাড়াও আব্বাদের পরিবার থেকে যখন বিয়ের প্রস্তাব দেওয়া হয়, তখন আম্মা নিজেই খুব দ্রুত ও সাহসী সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। নিশ্চিতভাবেই এটি ছিল প্রথা ভাঙার একটি সুস্পষ্ট ইঙ্গিত। যদিও আনুষ্ঠানিক ব্যবস্থার মাধ্যমেই তাদের বিয়ে হয়েছিল, তবু এবিষয়টি নিয়ে বিয়ের অনেক পরেও তারা আলাপে মজে উঠতেন ও খুব আনন্দ পেতেন। ঘরের বাইরে দুজনে একসাথে সিনেমা দেখতে যাওয়া নিয়ে আলাপচারিতা ছিল তাদের কথপোকথনের প্রিয় একটি বিষয়। সে কথা শুনে আমি উপলব্ধি করতাম, তাদের মধ্যে বোধ হয় 'বিয়েসংক্রান্ত কথাবার্তা'র সূচনাতেই একসঙ্গে সিনেমা দেখতে যাওয়ার সিদ্ধান্তটি একটি অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বিষয় ছিল! আমার আব্বার মতে, পত্রিকায় প্রকাশিত রিপোর্টগুলো কিন্তু আমার আম্মার নৃত্যের পরিবেশনাকে কেন্দ্র করেই তৈরি হতো, যদিও আম্মার করা সেই নাটকগুলো রবীন্দ্রনাথেরই রচিত ও নির্দেশিত ছিল।

আমার যখন জন্ম হয়, আমার মাকে রবীন্দ্রনাথ বলেন যে শিশুর নামের ক্ষেত্রে অতি-ব্যবহারে জীর্ণ নামগুলোর পুনরাবৃত্তি বেশ একঘেয়ে বিষয়। এই বলে রবীন্দ্রনাথ নিজেই আমার জন্য একটি সুন্দর নতুন নাম প্রস্তাব করেন। আমাকে দেওয়া সেই নাম হলো—অমর্ত্য। সংস্কৃত ভাষায় 'অমর্ত্য' অর্থ হলো'অমর'। সংস্কৃত ভাষায় এর বিপরীতার্থক শব্দ হলো'মর্ত্য'। 'মর্ত্য' শব্দের অনেক অর্থের মধ্যে একটি অর্থ হলো'মৃত্যু'। অর্থাৎ 'মর্ত্য' মানে, আমাদের এই পৃথিবী, যেখানে মানুষ মরে যায়। কিন্তু অমর্ত্য হলো এমন মানুষ যে মরবে না, যে স্বর্গ থেকে আগত। আমার নামের এই কঠিন অর্থ বহু লোকজনকে বোঝাতে বেশ বেগ পেতে হয়। ফলে লোকদের বোঝানোর এই কষ্টসাধ্য কাজটি এড়ানোর জন্য আমি এর গূঢ় অর্থে না গিয়ে, কথাবার্তার সুবিধার জন্য সংক্ষেপে এর অর্থটি বলে চালিয়ে দিই। তাদের বলি—'অমর্ত্য' শব্দের মানে হলো'অলৌকিক'।

বাঙালি সংস্কৃতিতে একটি পুরোনো রীতি হলো প্রথম সন্তান ভূমিষ্ট হয় মায়ের পৈত্রিক বাড়িতে। অর্থাৎ সন্তানের নানাবাড়িতে। মেয়েদের বিয়ে হওয়ার পর নতুন যে বাড়ি, সেখানে প্রথম সন্তান জন্ম নেওয়ার রীতি নেই এই অঞ্চলে। আমার মনে হয় এই রীতিটির মূলে রয়েছে মেয়ের বাবা-মায়ের পরিবারের

সদস্যদের জীবনের নিরাপত্তার বিষয়ে সংশয়ী মনোভাব থেকে রীতিটি উদ্ভূত। কারণ, গর্ভাবস্থায় শ্বশুরবাড়িতে মেয়ের মানসিক ও স্বাস্থ্যের অবস্থার পর্যাপ্ত ব্যবস্থা করা হচ্ছে কিনা, সে বিষয়ে মেয়ের পরিবারের উদ্বেগ রয়েই যায়। এই রীতি অনুসরণ করেই আমার মা ঢাকা থেকে শান্তিনিকেতনে আমার নানাবাড়িতে চলে আসেন, যেখানে আমি জন্মাই। আমি জন্ম নেওয়ার মাত্র দুই মাসের মাথায় আমার মা আমাকে কোলে নিয়ে ঢাকায় ফেরেন।

বাংলা ভাষায় শান্তিনিকেতন মানে হলো 'শান্তির বাসস্থান।' ফলে শান্তিনিকেতনও আমাকে ঢাকার বাড়ির মতোই আরেকটি ঠিকানা দিল। শুরুতে শান্তিনিকেতনের বাড়িটি শান্তিনিকেতন বিদ্যাপীঠ থেকে আমার নানাকে থাকার জন্য দেওয়া হয়। এটি দেখতে একটি সাধারণ দোচালা ছনের কুটিরের মতো হলেও এর মধ্যেও আভিজাত্য প্রকাশ পেত। আমার নানাবাড়িটি ছিল শান্তিনিকেতনের এমন একটি অংশে, যেদিকটিকে বলা হতো 'গুরুপল্লী', অর্থাৎ শিক্ষকদের বসবাসের গ্রাম। এরপর আমার বাবা-মা ১৯৪১ সালে শান্তিনিকেতনের অন্য প্রান্ত যাকে 'শ্রীপল্লী' বলা হয়, সেখানে ছোট্ট একটি বাড়ি নির্মাণ করেন তাদের নিজেদের বসবাসের জন্য। বাবা-মা নতুন এই বাড়িটির নাম দেন 'প্রতীচী'। সংস্কৃত ভাষায় 'প্রতীচী' শব্দের অর্থ হলো'পশ্চিমের শেষ সীমা'। পরবর্তী সময়ে আমাদের এই নতুন বাড়িটির খুব কাছেই আমার নানা তাদের থাকার জন্য নতুন একটি বাড়ি নির্মাণ করেন। নানার এই নতুন বাড়িটি নির্মাণের পেছনে কারণ ছিল তিনি শান্তিনিকেতনে শিক্ষকতার কাজটি ছেড়ে দেওয়ার পরিকল্পনা করছিলেন। আর শিক্ষকতার কাজটি ছেড়ে দিলে কোনো না কোনো পর্যায়ে তাঁকে শিক্ষকদের নিবাস গুরুপল্লীর বাড়িটি আনুষ্ঠানিকভাবে ছেড়ে দিতে হবে, এমন ভাবনা থেকেই তিনি এই নতুন বাড়িটি নির্মাণ করেন।

আমি আমার নানির খুব আদরের ছিলাম। আমার নানির নাম কীরণবালা। তাঁকে আমি 'দিদিমা' বলতাম। তিনি ছিলেন একজন মেধাবী মৃৎশিল্পী। মাটির বিভিন্ন পাত্রে তাঁর আঁকা শিল্পকর্মগুলো তাঁর সমৃদ্ধ মেধার পরিচয় বহন করত। এ ছাড়া তিনি ছিলেন অত্যন্ত দক্ষ একজন ধাত্রী। সে সময়ের আধুনিক চিকিৎসাপূর্ব শান্তিনিকেতনে যত শিশু জন্ম নিত, তার সবই তাঁর হাতেই জন্মাত। এমনকি তাঁর নিজের সব নাতিপুতির জন্ম তাঁর নিজের হাতেই হয়েছে। বহু বছর ধরে ধাত্রীর কাজ করতে গিয়ে তিনি মাতৃপ্রসবজনিত বিদ্যার বিশাল এক ভান্ডার অর্জন করেছিলেন। আমার দিদিমার কথাগুলো খুব স্পষ্টই আমার মনে গেঁথে আছে। তিনি আমাকে ব্যাখ্যা করছিলেন, প্রসূতির জীবনের নিরাপত্তায় জীবাণুমুক্ত সামগ্রীর ব্যবহার বাঁচা-মরার মতো চরম বাস্তবতার ক্ষেত্রে কতটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। কিন্তু এর থেকে আরও যেটি গুরুত্বপূর্ণ, তা হলো—জীবাণুমুক্ততার বিষয়ে জ্ঞানকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেওয়া। উদাহরণস্বরূপ এন্টিসেপটিক বা জীবাণুমুক্ত সামগ্রীর ব্যবহারের কথা তিনি জোর দিয়ে বলতেন। এন্টিসেপ্টিকের পর্যাপ্ত পরিমাণ বুদ্ধিদীপ্ত প্রয়োগ পরিস্থিতিতে কতটা পার্থক্য সৃষ্টি করতে পারে, তা তিনি শিখেছিলেন নিজেরই অভিজ্ঞতা থেকে। অথচ সেই সময়ে শান্তিনিকেতনের বাড়িঘরে যেসব শিশু ভূমিষ্ঠ হতো, তাদের বাড়ির লোকেরা এ বিষয়টির প্রতি প্রায়শই অবহেলা করত। আমি তাঁর কাছ থেকে নতুন অনেক কিছুই শিখেছিলাম। কিন্তু ভারতে শিশু জন্মের ক্ষেত্রে প্রসূতি মা ও জন্মের সময় শিশুমৃত্যুর উচ্চহার খুব সহজেই এড়ানো যেত, যা খুব সাধারণ কিছু সতর্কতাকে অবহেলার কারণেই ঘটে। পরবর্তী সময়ে আমার কর্মজীবনে, প্রসূতিমৃত্যু ও প্রসবের সময় শিশুমৃত্যুর হার নিয়ে আমি গবেষণা করতে গিয়ে দেখেছি, আমার দিদিমার সঙ্গে আমার দীর্ঘ আলাপচারিতায় দিদিমা যে কথাগুলো বলতেন সেগুলোই সত্য। সেই সময়ে দিদিমা রান্নাঘরে বেতের মোড়ায় বসে কাজ করতেন আর গল্প করতেন, আর আমি তাঁর পাশে বসে সেগুলো শুনতাম। ফলে দিদিমার প্রতিটি কাজের পেছনে তাঁর বৈজ্ঞানিক মনোভাবের প্রতি আমার গভীর অনুরাগ সৃষ্টি হয়।

চার.

ছেলেবেলা থেকেই আমার দেখা ছোট্ট দুটি শহর—ঢাকা ও শান্তিনিকেতনকে আমি খুবই ভালোবাসতাম। কিন্তু তা সত্ত্বেও আমার জীবনের সবচেয়ে পুরোনো স্মৃতিগুলো এই শহর দুটোকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠেনি। আমার জীবনের প্রথম স্মৃতিগুলো বার্মাকে কেন্দ্র করে তৈরি হয়েছে। কারণ, আমার বয়স তিন বছর পূর্ণ হওয়ার মাত্র অল্প কয়েক দিন আগে আমার বাবা-মা বার্মায় চলে আসেন। সেখানে আমরা যাই ১৯৩৬ সালে এবং ১৯৩৯ সাল পর্যন্ত সেখানে ছিলাম। এর কারণ ছিল আমার বাবা তিন বছরের জন্য তাঁর নতুন কর্মস্থল বার্মায় ছিলেন। আব্বা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ছুটিতে তিন বছরের জন্য 'মান্দালয় কৃষি কলেজ'-এ অতিথি অধ্যাপক হিসেবে পড়াতে যান। আমি ভ্রমণের ব্যাপারে রোমাঞ্চ অনুভব করলেও প্রিয় দিদিমাকে ছেড়ে যাওয়া আমার জন্য সহজ ছিল না। বিদায়ের মুহূর্তটি কেমন ছিল সেটি আমার মনে নেই। তবে পরে আমি শুনেছিলাম, কলকাতা থেকে রেঙ্গুনের উদ্দেশে জাহাজটি যখন ছেড়ে যাচ্ছিল, তখন বন্দরে বিদায় জানাতে আসা আমার দিদিমার অবয়বটি ক্রমে ম্লান ও ধীরে ধীরে ছোট হয়ে সরে যাচ্ছিল বলে আমি তীব্রভাবে বিশাল জাহাজটিকে থামানোর জন্য জোরে জোরে চীৎকার করছিলাম। সুখের কথা হলো, দিদিমার সঙ্গে আমার এই বিচ্ছেদ অনন্তকালের জন্য ছিল না। প্রতি বছরই আমরা ঢাকা ও শান্তিনিকেতনে ছুটিতে ফিরে আসতাম। আমার মতোই আমার বোনেরও জন্ম যথারীতিতে শান্তিনিকেতনের নানা বাড়িতে। কিন্তু বার্মায় আমার মতো তাকে তিন বছর কাটাতে হয়নি। সে তার জীবনের প্রথম দেড় বছর বার্মার কাটানোর সুযোগ পেয়েছে। ১৯৩৯ সালে পুরোনো ঢাকার ওয়ারীর শান্ত-সুন্দর বাড়িটিতে আমরা ফিরে আসি। আর তখন থেকেই শান্তিনিকেতনের নানা বাড়িতে নিয়মিত আসা-যাওয়ার যোগাযোগটি পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়।

বার্মায় থাকার সময়টি যখন ফুরিয়ে আসছিল, তখন আমার বয়স ছিল প্রায় ছয় বছর। এই বয়স থেকেই আমার জীবনের ঘটনাগুলোর স্মৃতি আমার করোটিতে জমতে থাকে। মান্দালয়ে থাকতে আমি বেশ সুখে ছিলাম। সেখানকার নানা ধরনের রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা আমার খুব স্পষ্টই মনে আছে। বিশেষ করে বার্মিজ উৎসবগুলো ছিল খুবই দারুণ। বাজারগুলো ছিল বেশ মুখরিত। মজার মজার অনেক খেলা ও খেলনায় বাজার ভরা থাকত। বার্মায় আমরা যে বাড়িটিতে ছিলাম সেটি ছিল কাঠের তৈরি। বাড়িটির অঙ্গসজ্জা ছিল মান্দালয়ের সনাতনী ধারার। কিন্তু আমার চোখে বাড়িটির সৌন্দর্যের কোনো শেষ ছিল না। এই বাড়িটিতে থাকতে আমি ভীষণ উপভোগ করতাম। নতুন কিছুর প্রতি আমার আকর্ষণ ছিল তীব্র, বিশেষ করে মনকাড়া উজ্জ্বল রঙের প্রতি। যখনই আমি আব্বা-আম্মার হাত ধরে কিংবা আমাদের বাসার আয়ার সঙ্গে বাইরে যেতাম, তখন যা-কিছুই চোখে পড়ত সেগুলোর প্রায় সবকিছুরই বার্মিজ ভাষ্য জেনে নিতাম।

বাবা-মায়ের সঙ্গে বার্মার নতুন নতুন জায়গা ভ্রমণ আমার জন্য ছিল অত্যন্ত রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা। সেসব দর্শনীয় স্থানের মধ্যে রেঙ্গুন তো বটেই, এছাড়াও বার্মার বিভিন্ন জায়গা যেমন পেগু, পাগান এমনকি এগুলো থেকে অনেক দূরের ভামোও ছিল। সেসব জায়গায় পৌঁছে আমি উপলব্ধি করতাম যে এসব জায়গার অত্যন্ত সমৃদ্ধ ইতিহাস রয়েছে। বড় বড় সব বিল্ডিং ও প্যাগোডা ছিল রাজকীয় প্রাসাদের মতো দেখতে। কতগুলো স্থাপনাকে আমি আস্ত একখানা রাজপ্রাসাদ বলেই ঠাহর হতো। মায়মো জায়গাটি দেখতে আমার ভারি ভালো লাগত। তবে আমাদের বাসা থেকে মায়মো ছিল বেশ খানিকটা দূরে। সাপ্তাহিক ছুটি কাটাতে প্রায় ২৫ মাইল দূরের এই মায়মোতেই আমাদের পরিবার ও বন্ধুদের পরিবারসহ বেড়াতে যেতাম।

সাহিত্যিক জর্জ অরওয়েল একসময় স্থায়ীভাবে বার্মায় থাকতে শুরু করেন। অরওয়েলের লেখায় মান্দালয় থেকে মায়মো যাত্রার প্রলুব্ধকর ও আকর্ষণীয় বর্ণনা পাওয়া যায়। অনেক পরে অরওয়েলের লেখা বার্মার দৃশ্যকল্পগুলোর বিবরণ পড়ে আমি একদম মোহাবিষ্ট হয়ে পড়ি। তাঁর ভষায়:

> *মায়মোতে ট্রেনটি পৌঁছে গেলেও মানসিকভাবে আপনি মান্দালয়তেই পড়ে থাকবেন। মায়মো হলো সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে চার হাজার মাইল উঁচুতে। কিন্তু গাড়ি থেকে নেমে বাইরে পা রাখামাত্রই যে-কারোরই মনে হবে যে, তিনি সম্পূর্ণ অন্য এক গোলার্ধে এসে পৌঁছে গেছেন। হঠাৎ আপনার নাকে পাতলা মিষ্টি হাওয়ার শ্বাস-প্রশ্বাস নিতে শুরু করবেন। তখন মনে হবে যেন আপনি ইংল্যান্ডে চলে এসেছেন। আপনার চারপাশের সবটাই সবুজ ঘাসের বেষ্টনীতে ঘেরা। সবুজ ঘাসের প্রান্তরের মধ্যে রয়েছে অসংখ্য ছোট-বড় দেবদারুগাছ। আর সেখানে পাহাড়ি মেয়েরা গোলাপী রঙের টুকটুকে গাল নিয়ে ঝুড়িতে করে স্ট্রবেরি ফল বিক্রি করছে।*

আমরা মান্দালয় থেকে মায়মো যেতাম ব্যক্তিগত গাড়িতে করে। আব্বা গাড়ি চালাতেন। মাঝে মাঝে পথে বিরতি দিয়ে আব্বা সুন্দর সুন্দর জায়গা দেখাতেন। যাত্রাপথে আমার এক রাতের কথা মনে পড়ে। ঘটনাটি উপভোগ করতে পারা ছিল আমার জন্য অত্যন্ত রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা। একটি বড়সড় চিতাবাঘ হঠাৎ আমাদের গাড়ির সামনে এসে পড়ে। গাড়ির হেডলাইটে চিতাবাঘটির চোখের মণিকোঠা দুটি খুব জ্বলজ্বল করছিল।

ইরাবতী নদীতে নৌকা ভ্রমণের সময়, আমাদের আশপাশের প্রাকৃতিক দৃশ্যগুলো প্রতি মুহূর্তেই নতুন রূপে বদলে যেত। নদীর তীরে হেঁটে বেড়ানোর সময় আমি সেখানকার মাটি ও মানুষ সম্পর্কে জ্ঞান লাভের চেষ্টা করতাম। সেখানকার বিভিন্ন আদিবাসী, নানা ধরনের গোত্র ও গোষ্ঠী এবং বিভিন্ন জাতিসত্তার মানুষজন বেশ আকর্ষণীয় পোশাক পরে আসত। আমার জীবনকে সমৃদ্ধ করতে অগুনতি অভিজ্ঞতা ও বিচিত্র সব দৃশ্যকল্পের এক বিশাল ভান্ডার উপহার দিয়েছে বার্মা। বার্মা থেকেই আমার সামনে সমগ্র পৃথিবীর দুয়ার উন্মুক্ত হয়। আমি আমার পরবর্তী জীবনে যা-কিছু দেখেছি, তার সঙ্গে এর কোনো তুলনাই হতে পারে না। কিন্তু তা সত্ত্বেও আমার নবীন চোখে অবশিষ্ট পৃথিবীর সৌন্দর্যটি এড়িয়ে যায়নি।

পাঁচ.

অনেকে মান্দালয়কে 'দ্য গোল্ডেন সিটি' ('সোনালী শহর') বলে থাকেন, কারণ শহরটি সুন্দর সব প্যাগোডা ও দর্শনীয় স্থানে ভরা। এই শহর নিয়ে সাহিত্যিক রুডিয়ার্ড কিপলিং একটি কবিতা লিখেছিলেন যদিও তিনি কখনো বার্মায় যাননি। কিন্তু 'মান্দালয়' নামে যে মার্জিত কবিতা তিনি লিখেছিলেন, সেটি মান্দালয় নিয়ে তাঁর রোমান্টিক ভাবনায় ছিল ভরপুর। তবু আমার বাবার মতে, কবিতাটির বস্তুগত ত্রুটি ছাড়া অন্যসব কিছু তার ভালো লেগেছিল। বাবার কথা শুনে আমি সেসব সমস্যা ভূগোলবিদদের ঘাড়ে চাপিয়ে দিলাম এবং সিদ্ধান্ত নিলাম যে কবিতার কল্পচিত্রে নিজেকে ভাসিয়ে দেব। কিপলিংয়ের কবিতার একটি পঙ্‌ক্তি ছিল "ভোরের আলো ফুটে উঠছে দেখে মনে হচ্ছে যেন চীনের আকাশে বজ্রপাত হলো"— 'উপসাগর'।

জর্জ অরওয়েলের মূল নাম ছিল এরিক আর্থার ব্লেয়ার। তিনি বহু বছর মান্দালয়ে থেকেছেন। ১৯২২ সালে তিনি পুলিশ একাডেমিতে চাকরি নিয়ে মান্দালয়ে চলে আসেন। প্রথম প্রথম তাঁর কাছে এটি ছিল 'ধুলোময়

ও অসহনীয় গরমের' জায়গা এবং সাধারণভাবে তাঁর কাছে মনে হতো 'শহরটি কোথায় যেন আপসহীন' ভাব নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। কিন্তু মান্দালয় আমার কাছে তা ছিল না। আমার কাছে মান্দালয় শহরের অর্থ ছিল ভিন্ন মাত্রার। আমার স্মৃতিতে মান্দালয় হলো মানুষ ও পরিবেশের মধ্যে সৌম্য ঐক্যের বন্ধনে মোড়া একটি শহর। কারণ, আমার চোখে দৃষ্টিনন্দন সব দালানকোঠা, অপূর্ব বাগবাগিচা, অজানা গন্তব্যে ছোটা কৌতূহলী সব রাস্তাঘাট, গাম্ভীর্য নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা পুরোনো সব রাজপ্রাসাদ যার চারপাশটি সৌম্য পরিখার বেষ্টনীতে ঘেরা। এই সবকিছুর বাইরেও বার্মার মানুষগুলোকে আমার কাছে অত্যন্ত উষ্ণ মনে হতো। তাদের মুখে হাসি লেগেই থাকত এবং আপনি তাদের সঙ্গে কথা বললে পছন্দ না করে থাকতে পারবেন না।

আমার বাবা পিএইচডি সফলভাবে সমাপ্ত করায় লোকে তাঁকে 'ড. সেন' বলত। ফলে প্রায়ই দেখা যেত যে আব্বার অজানতেই আমাদের বাসায় স্বপ্রণোদিত হয়ে অনেক অতিথি চলে আসত এবং বলত, 'ড. সেনের কাছে ডাক্তারি পরামর্শের জন্য এসেছি।' আমার বাবার অবশ্য ওষুধবিদ্যা সম্পর্কে কোনো ধারণা ছিল না। এসব ঘটনার পরও অবশ্য আব্বা আমাকে বলেছিলেন যে, 'আমরা আসলে বৃহৎ অর্থে ডাক্তার গোত্রেরই—বৃহৎ জ্ঞানশাস্ত্রেরই আওতায় পড়ি—অবশ্য সেটি ছিল বহু প্রজন্মের আগের কথা। তা সত্ত্বেও তিনি বিরক্ত না হয়ে রোগীদের যথাসাধ্য করতেন, যেন তারা 'মান্দালয় সরকারি হাসপাতাল'-এর সেবা ও চিকিৎসা যতটা সম্ভব ভালো পেতে পারে।

আজকের বার্মাতেও সেখানকার জনগণের স্বাস্থ্যের সমস্যার জন্য দৃষ্টি আকর্ষণ করতে শোনা যায়, যেটি আশপাশের অন্যসব দেশ থেকে অন্তত শোনা যায় না। যেমন থাইল্যান্ড। থাইল্যান্ড জনস্বাস্থ্যে খুব ভালো সরকারি ব্যবস্থা গড়ে তুলেছে। বার্মার জাতিগত সমস্যা রাষ্ট্রটিকে মোটামুটি অচল করে দিয়েছে। কিন্তু সমস্যা হলো যেসব ছোট ছোট জাতিসত্তা নিজেদের অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে ক্ষমতাসীনদের বিরুদ্ধে লড়ছে, তারাও সঠিক কোন দিশা দেখাতে পারছে না। সামরিক শক্তি সেখানে বাইরে থেকে নিপীড়ন চালিয়ে তাদের জমি থেকে উচ্ছেদ করে দিচ্ছে, ফলে আজকের দিনেও সেখানে স্বাস্থ্যসেবার কোনো সু-স্থায়ী ব্যবস্থা গড়ে তোলা যায়নি। ফলে বার্মায় চিকিৎসাসেবা সাধারণের কাছে খুবই অপ্রতুল। তা সত্ত্বেও সাধারণ মানুষের স্বাস্থ্যের জরুরি প্রয়োজনে যখন চিকিৎসাসেবার দরকার হয়, তখন যুক্তরাষ্ট্রের 'জন হপকিন্স মেডিকেল স্কুল'-এর একদল 'সংকল্পী বিশেষজ্ঞ'র কাছে সাহায্যের আবেদন করা হয়। এই দৃঢ় অঙ্গীকারসমৃদ্ধ দলটি পৃথিবীর বিভিন্ন বিপদসঙ্কুল জায়গায় নিজেদের জীবনের ঝুঁকি নিয়ে উজ্জ্বল সব দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। মানবিক কর্তব্যের এই কাজ করার সময় দলটির ছয়জন মহৎপ্রাণ সদস্যকে ১৯৯৮ থেকে ২০০৫ সালের মধ্যে হত্যা করা হয়। উদাহরণস্বরূপ কারেন নামে একজন অসুস্থ রোগীর জরুরি ভিত্তিতে চিকিৎসার প্রয়োজনে আপনি সাড়া দেওয়ার ফলে নিজের প্রাণ বিসর্জন দিতে হলো।

ছয়.

বেড়ানোর প্রয়োজনে মান্দালয়ের বাইরে গেলে মান্দালয়ে ফিরে আসার অনুভূতি আমার জন্য ছিল অত্যন্ত আনন্দের স্মৃতি। আমাদের বাড়িটি ছিল মান্দালয় শহরের পূর্বপ্রান্তের একদম শেষ সীমানায়। মান্দালয় কৃষি কলেজ ক্যাম্পাসের ভেতরে আমাদের কাঠের তৈরি বাড়িটি দেখে মনে হবে যেন এক সৌম্য সত্তা দাঁড়িয়ে আছে। বাড়ির জানালা দিয়ে মিমো পাহাড়ের অপূর্ব দৃশ্য উপভোগ করা আমার কাছে বাড়িটির আকর্ষণ আরও বহুগুণে বাড়িয়ে দিয়েছিল। বাড়ির প্রশস্ত বারান্দায় দাঁড়িয়ে মিমো পাহাড়ের আড়াল থেকে ভোরের সূর্যোদয় দেখে আমি অভিভূত হয়ে পড়তাম। ফলে মান্দালয় ছিল আমার নিজেরই প্রাণপ্রিয় ঘর,

ঠিক যেমনটি ছিল পুরান ঢাকার বাড়িটি, মানিকগঞ্জের মত্তের মায়ময় আবাসটি; আর ঠিক তেমনই শান্তিনিকেতনের বাড়িটি আমার কাছে সমান পছন্দের ঘর ছিল। আমার কাছে এগুলোর কোনোটিই কারোর তুলনায় কোনো অংশেই কম ছিল না।

তবে যেভাবেই ব্যাখ্যা করি না কেন, আমার অনুভূতিতে বার্মা বিশেষ সংবেদনশীলতার অর্থ বহন করত। এ ছাড়া আমার জীবনের প্রারম্ভস্মৃতির প্রথম দেশ বার্মা। আমি বার্মিজ ভাষাও কিছুটা শিখেছিলাম এবং ভাঙা ভাঙাভাবে সেটি দিয়ে কিছুটা আলাপও করতে পারতাম। আমায় দেখভাল করা বার্মিজ আয়া, যিনি আমার বোন জন্মের পর আমাদের দুজনকেইদেখাশোনা করেছেন—তিনি কিছু বাংলা ভাষার শব্দও জানতেন, এমনকি তিনি অল্পস্বল্প ইংরেজি ভাষাতেও কথা বলতে পারতেন। আমার মনে আছে, সেই সময়ে আমি যতটা ইংরেজি বলতে পারতাম, তার থেকেও তিনি ইংরেজি ভালো জানতেন। তাঁর মুখটা আমার চোখে এখনো ভাসে। তিনি কি সুন্দরীই না ছিলেন! পরে, আমার বয়স যখন ১২ হয়, আমি আম্মার কাছে জানতে চেয়েছিলাম, তিনি কি সত্যি সত্যিই দেখতে সুন্দর টুকটুকে গোলাপী রঙের ছিলেন কি না। জবাবে আম্মা বললেন, তিনি সত্যিই 'খুব সুন্দরী' ছিলেন। আম্মার কাছ থেকে বিষয়টি অনুমোদনের পর আমারও মনে হতো যে আমি যে ভাষাতেই তাঁর সৌন্দর্যের বিবরণ দিই না কেন, সেটি তাঁর নিজস্ব সৌন্দর্যের তুলনায় যথার্থ হবে না।

কিন্তু তাসত্ত্বেও সৌন্দর্যই আমার প্রিয় আয়াদির একমাত্র বিশেষত্ব ছিল না। তীব্র আক্ষেপ নিয়েই বলতে হচ্ছে, তাঁর নামটি যেন আমি মনে করতে পারি। তিনি আমাদের বাসার সবাইকেই বলে দিতেন কীভাবে কী করতে হবে। আমার মনে আছে, আম্মা কোনো কাজ করার আগে প্রায়ই তাঁর পরামর্শ নিতেন। তাঁর পরামর্শগুলো ছিল অত্যন্ত সুচারু ও নিপুণ। তিনিই আমার বাবা-মাকে বলে দিতেন যে বাইরে থেকে বাড়িতে ফেরার কোন পথটি দিয়ে এলে বাসায় পৌঁছতে সবচেয়ে সুবিধা হবে। বাবা-মা বাইরে থেকে ফিরলে আমার পেনসিলে আঁকা তারতাজা ছবিগুলো তিনি বাসার ড্রইংরুমের দেয়ালে টানিয়ে দিয়ে তাঁদের পুলকিত করতেন। আর আমাকে তাঁদের কাছে তিনি মেধাবী শিল্পী হিসেবে তুলে ধরতেন। তাঁর এ ধরনের প্রোৎসাহের ধাক্কায় আমার নিজস্ব সীমাবদ্ধতা নিয়ে আমি নিজেই নিজেকে ধিক্কার দিতাম। কখনো কখনো আমি অধৈর্য্য হয়ে উঠতাম এই ভেবে যে, আমার শৈল্পিক মেধা নিয়ে আমি আরও একটু চেষ্টা করতে পারতাম, যেটি আমার মধ্যে আয়াদি আবিষ্কার করেছিলেন।

বার্মায় নারীরা কিন্তু বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে। অনেক আর্থিক কর্মকাণ্ডেরই একেবারে কেন্দ্রে আছে সেখানকার নারীরা। পরিবারের ভেতর সিদ্ধান্ত গ্রহণেও নারীদের মতামত বেশ শক্তিশালী। এই দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে বার্মার সঙ্গে আফ্রিকা মহাদেশের সাব-সাহারা অঞ্চলের এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বেশ খানিকটা মিল রয়েছে। কিন্তু ভারতের অধিকাংশ অঞ্চলের মেয়েদের সঙ্গে এর মিল নেই। এমনকি বর্তমান পাকিস্তান কিংবা পশ্চিম এশিয়াতেও এটি নেই। বার্মায় আমার প্রারম্ভিক স্মৃতিগুলোর মধ্যে সবচেয়ে জীবন্ত স্মৃতি হলো, সমাজে নারীর অমোচনীয় অবদানের ঘটনাগুলো। সে সময় যখন আমার বয়স মাত্র পাঁচ কি ছয় বছর, সেরকম বয়সে সমাজে নারীর অবদানকে আলাদা করে বোঝার কথা নয়। কিন্তু পরে যখন আমি আমার জীবনে বার্মা ছাড়া বাদবাকি সমাজ ও সংস্কৃতি সম্পর্কে বোঝার ক্ষমতা হয়েছে, তখন বার্মার স্মৃতিগুলোই ছিল আমার বিশুদ্ধ মানদণ্ড, যার সঙ্গে আমি জীবনে বাকি যা-কিছুই দেখি না কেন সেসব কিছুর তুলনা করেছি। এমনকি এটিও হতে পারে যে, লিঙ্গ সমতার দাবি ও অঙ্গীকার নিয়ে আমার গবেষণাতেও এর প্রভাব পড়েছে। আমার বার্মার অভিজ্ঞতাই নারীর এজেন্সি বা করণভবনকে গুরুত্বের সঙ্গে সামনে আনার ভাবনাকে তাড়িত করেছে। আমার জীবনের পরবর্তী অংশে এই বিষয়টিই আমার গবেষণার বিষয় হয়ে ওঠে।

সাত.

আমার ছেলেবেলার বার্মার স্মৃতিগুলো এখনো আমার মনে থাকার অনেক কারণের মধ্যে এটিও একটি কারণ যে, আমার মনটা এখনো বার্মায় পড়ে থাকে। বার্মা সম্পর্কে আমার অনুরাগ আরও বহুগুণে বেড়ে যায়, যখন অং সান সু চি সম্পর্কে আমি জানতে পারি। সু চি আমার দেখা একজন অসাধারণ নারী। ১৯৬২ সালে সেনাবাহিনী সীমাহীন হিংস্রতা চালিয়ে দেশের ক্ষমতা দখল করার পর সু চি অসীম সাহসিকতা ও দূরদৃষ্টি নিয়ে নেতৃত্ব দিয়ে সেই অচলায়তন ভেঙে দেশকে মুক্ত করেন। আমি সু চিকে একজন আপসহীন নেত্রী হিসেবেই জানতাম। ফলে আমি নিজেকে খুব সৌভাগ্যবান মনে করতাম এই ভেবে যে, আমি এমন একজন অসাধারণ ও সাহসী নারীর সঙ্গে আমার পরিচয় আছে। আমি এই ভেবেও গর্বিত ছিলাম যে বার্মায় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় তিনি অকথ্য নির্যাতন ও দীর্ঘ ১৫ বছরেরও বেশি সময় গৃহবন্দী হয়ে থেকেছেন। আমার সঙ্গে তাঁর স্বামী মিশেল আরিসেরও পরিচয় হয়েছিল। স্ত্রীভক্ত এই স্বামীটি ছিলেন এশিয়া বিষয়ের ওপর একজন উঁচুমাপের পণ্ডিত ব্যক্তি। বিশেষ করে তিব্বত ও ভুটান নিয়ে তাঁর গবেষণা সুবিদিত।

সেনাবাহিনী অত্যন্ত চাতুর্যপূর্ণভাবে মিশেলকে বার্মা থেকে বহিষ্কার করে। কর্মসূত্রে তিনি ছিলেন যুক্তরাজ্যের অক্সফোর্ডের বাসিন্দা। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের সেন্ট জোনসকলেজের সম্মাননীয় ফেলো হিসেবে তিনি কর্মরত ছিলেন। অগত্যা তিনি অক্সফোর্ডে থেকেই সু চিকে সর্বোতভাবে সাহায্যের চেষ্টা করেছেন। শুধু নিজের স্ত্রীকেই নয়, বার্মা দেশটি পুনরুদ্ধারের জন্যও কাজ করেছেন। ১৯৯১ সালে সু চিকে নোবেল শান্তি পুরস্কার দেওয়ার ঘোষণার পরপরই মিশেল (যুক্তরাষ্ট্রের) হার্ভার্ডে আসেন আমার সঙ্গে দেখা করতে। পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠানে মিশেলের সঙ্গে আমি উপস্থিত থাকতে পেরে উচ্ছ্বসিত হয়েছিলাম। কিন্তু তখন জানতাম না যে দুঃখের সময় এই এল বলে। সেটি ছিল ১৯৯৯ সাল। মিশেল তখন কর্কট রোগে মৃত্যুপথযাত্রী। সেটি ছিল মেটাস্টেসাইজ ক্যানসার। ততদিনে আমি যুক্তরাষ্ট্রের হাভার্ড থেকে যুক্তরাজ্যের কেমব্রিজের ট্রিনিটি কলেজে চলে গেছি। ১৯৯৯ সালের মার্চ মাসের শেষ দিকের কোনো এক সকালবেলার কথা। আমার ফোন বেজে ওঠে। আমি ভয়ে ভয়ে ফোনটি তুলি। ওপাশ থেকে মিশেলের কণ্ঠস্বর। মিশেল আমাকে বলছিলেন, যদিও ডাক্তার তাঁকে বলে দিয়েছেন তিনি আর বাঁচবেন না, তবু তিনি সেকথা বিশ্বাস করেন না। কারণ, 'আমার সু ও বার্মার জন্য এখনো অনেক জরুরি সব কাজ বাকি রয়ে গেছে।' তাঁর সেই জরুরি কাজগুলোর কথা সবই আমি জানতাম। ফলে তাঁর মনে কী খেলে যাচ্ছিল তা বুঝতে পারছিলাম। ফোনালাপের ঠিক দুদিনের মাথায় অক্সফোর্ড থেকে আমার কাছে একটি চিঠি এল। মিশেল এইমাত্র মৃত্যুবরণ করেছেন। তারিখটি ছিল ২৭ মার্চ। সেদিন ছিল তাঁর জন্মদিন। সু কেবলমাত্র একজন ভালোবাসার সঙ্গীকেই হারাননি, সেই সঙ্গে তিনি এমন একজন প্রিয়তম বন্ধুকে হারিয়েছেন যিনি তাঁকে সবসময় সুপরামর্শ দিতেন ও তাঁর সাহায্যে সর্বদা ছিলেন নিবেদিতপ্রাণ।

২০১০ সাল। সে বছর সু চি অবশেষে সেনাবহিনীকে হটিয়ে বিজয়ী হন। দেশের রাজনৈতিক ক্ষমতার সর্বোচ্চ পদে তিনি নিজেকে অধিষ্ঠিত করতে পারেন বটে, তবে সে জন্য তাকে উচ্চমূল্যের ছাড় কবুল করতে হয়। যা হোক তখন থেকেই তার সমস্যাগুলো বাড়তে থাকে। কিন্তু কপালের লিখন যায় না খণ্ডন। বার্মার অন্যান্য মানুষের মতোই নিষ্ঠুর দুর্ভাগ্যের হাত থেকে তিনিও ছাড় পান না।

নিশ্চিতভাবেই সু চির নেতৃত্বে বড় ধরনের ভুল ছিল। বার্মার দুর্বল, নাজুক ও সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর প্রতি সাহায্যের হাত বাড়িয়ে না দেওয়ার সংকল্পটি ছিল তাঁর চরম ভুল সিদ্ধান্ত। বিশেষ করে তাঁদের মধ্যে বাংলাভাষী রোহিঙ্গা ক্ষুদ্রজাতিসত্তা থেকে তাঁর দৃষ্টি সরিয়ে নেওয়া ছিল অত্যন্ত গর্হিত কাজ। রোহিঙ্গা

ছাড়াও বার্মার অন্যান্য সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর প্রতিও তাঁর মনোভাব ভালো ছিল না। বার্মার সেনাবাহিনী রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে ভয়াবহ বর্বরতা চালায়। রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীকে সেনাবাহিনীর ধ্বংসযজ্ঞ থেকে রক্ষা করার জন্য সে সময় অসহিষ্ণু বৌদ্ধ অধিকারকর্মীরাও সু চিকে কোনো ধরনের সাহায্য করেননি।

সু চিকে বোঝার যদি কোনো ধাঁধাঁ থেকেও থাকে, তবে তার থেকেও কঠিন রহস্যের হলো সু চির ব্যক্তিত্বকে বোঝা। বিশেষ করে এটাই আমাকে বেশ পীড়া দিয়েছে। কারণ, আমার ছেলেবেলায় আমি বার্মিজদের দয়ালু আচার-ব্যবহারে একবারে অভিভূত ছিলাম। তাদের মতো মানুষ কেমন করে হঠাৎ রোহিঙ্গাদের প্রতি এতটা নির্মম হতে পারল? আর তা ছাড়া রোহিঙ্গাদেরও কেন এই পর্বতপরিমাণ গণহত্যা, বর্বরতা ও নির্যাতন সহ্য করতে হচ্ছে? এসব নির্মম নিষ্ঠুর ঘটনায় আমার মনটা খুব খারাপ হওয়ার বাইরেও আমি নিজেকে প্রশ্ন করেছি—মানুষ হিসেবে মানুষের প্রতি আমার যে স্বতঃস্ফূর্ত উষ্ণতা ও আবেগ কাজ করে, তার পুরোটা কি কেবলই মায়া নাকি বিভ্রম? কিন্তু কথা বলে আমি এও বুঝতে পেরেছি, অন্যান্য মানুষেরও তাদের প্রতি আমার মতোই সহানুভূতি ও উষ্ণতা রয়েছে। অ্যাডাম রিচার্ডস। জন হপকিনসের নিবেদিতপ্রাণ আমার ডাক্তার বন্ধুটি, যিনি মেডিকেল স্যুটকেস নিয়ে সর্বদা তৈরি থাকতেন স্বাস্থ্যসেবা বঞ্চিত নিরুপায় বার্মার রোগীদের স্বাস্থ্যসেবায় ঝাঁপিয়ে পড়তে। চিঠিতে তিনি আমাকে জানিয়েছিলেন, "এখানকার মানুষেরা সবসময়ই খুব হাসিখুশি, গলা ছেড়ে গান গায় আর হাসতে হাসতে লুটিয়ে পড়ে। এদের জীবনের রসবোধ দেখে যাপিত জীবনে ঘটে চলা সব প্রতিকূল পরিস্থিতিগুলোকেও মনে হতো যেন সেগুলোও তাদের জীবনের অনুপ্রেরণার উৎস।" ছেলেবেলার সেই সীমিত পরিধির ব্যক্তিগত অনভিজ্ঞতা ও অপরীক্ষিত মুগ্ধতা ছাড়া বার্মিজ জনগোষ্ঠী সম্পর্কে আমার অনুভবগুলো কেবল বাতুলতামাত্র।

বার্মার এই অনিবার্য পরিস্থিতি আমার দিকে একটি প্রশ্ন ছুঁড়ে দিয়েছে। প্রশ্নটি হলো,বার্মায় পরিবর্তনটি কোথায় ঘটেছিল? জবাবে আমি কেবল আমার জল্পনা-কল্পনার কথাগুলোই বলতে পারি। পরিস্থিতির ভিন্নতা নিয়ে আমার প্রথমেই যেকথাটি মনে আসে সেটি হলো, রোহিঙ্গা মুসলিম জনগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে তীব্র প্রচার-প্রপাগান্ডার বিষয়টি বেশ চোখে পড়ার মতো। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে সেনাবাহিনী পরিকল্পিত ও সংঘবদ্ধভাবে এই প্রচার-প্রপাগান্ডার কাজটি বেশ জোরেসোরেই চালিয়ে নিয়ে গেছে। সেনাবাহিনীর সেই নিখুঁত ও কূটপরিকল্পনার বাস্তবায়ন অত্যন্ত প্রভাবশালী এক ভূমিকা রাখে সমাজের মানুষের মনোভাবের পরিবর্তনে। ফলে আমাদের প্রতিবেশী ভদ্র বার্মিজ পরিবারগুলোর মধ্যে যাদের আমি জানি, তারাও খুব হিংস্র ও বিদ্বেষী মনোভাব ধারণ করতে শুরু করে রোহিঙ্গা মুসলিম জনগোষ্ঠীর সদস্যদের প্রতি। এই প্রচার-প্রপাগান্ডাই তাদের মনে ধীরে ধীরে বিদ্বেষের বিষবাষ্প ঢুকিয়ে দেয়। এই কাজে তারা বর্ণবিদ্বেষী প্রপাগান্ডার অস্ত্রটি খুব সংগঠিতভাবে ব্যবহার করে। শুধু তা-ই নয়, অত্যন্ত গোঁড়া, ধর্মান্ধ ও মৌলবাদী শক্তিশালী ভাষ্যও তারা বিপুলভাবে ব্যবহার করেছে নির্যাতন ও হত্যাকে বৈধতা দেওয়ার জন্যে। তাদের উদ্দেশ্য হলোবার্মা থেকে রোহিঙ্গা মুসলিম জনগোষ্ঠীকে নিশ্চিহ্ন করা।

একটি সভ্য ও ভদ্র জনগোষ্ঠীকে আমূল পাল্টে ফেলার দৃষ্টান্ত সারা দুনিয়ার জন্যই শিক্ষণীয়। প্রচার-প্রপাগান্ডার ক্ষমতা কেবল বার্মাতেই ঘটেছে, তা নয়। দুর্ভাগ্যজনকভাবে বর্তমান পৃথিবীর অনেক দেশেই এটি ঘটছে। বার্মা দেশটির বর্তমান নাম মিয়ানমার। দেশটির নামটাই সেনাবাহিনী পাল্টে দিয়েছে। নয়া নামকরণে তাদের চেয়ে আর সেরা কে হতে পারবে? বরং বলতে হবে যে, বার্মার সেনাবাহিনী বিশেষ বর্বর গোষ্ঠী। কিন্তু বার্মায় রোহিঙ্গা মুসলিম জনগোষ্ঠীর ওপর সেনাবাহিনীর অকথ্য নির্যাতনের মতো একইরকম উদাহরণ পৃথিবীর অন্যান্য দেশেও দেখা যায়। উদাহরণস্বরূপ হাঙ্গেরি তাদের দেশে আসা অভিবাসীদের প্রতি, পোল্যান্ড তাদের দেশের সমকামীদের প্রতি অথবা সমগ্র ইউরোপের বিভিন্ন দেশের জনগোষ্ঠী, যারা যাযাবর জীবন যাপন করে ও নানা স্থানে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রয়েছে তাদের প্রতি এই

ইউরোপীয় দেশগুলোর বিদ্বেষপূর্ণ ব্যবহারের ফল ভোগ করতে হচ্ছে। আমাদের সবার জন্যই এসব থেকে শিক্ষণীয় রয়েছে। বিশেষ করে সাবেক ধর্মনিরপেক্ষ দেশ ভারতের জন্য এসব ঘটনা থেকে অনেক বড় শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে। কারণ, বর্তমান ভারতে ধর্মীয় উগ্রবাদীরা খুব জোরেসোরেই কাজ করছে। কাগজে-কলমে সরকারি নীতি একভাবে লেখা থাকলেও বাস্তবে সংখ্যালঘু মুসলিম জনগোষ্ঠীর অধিকারের প্রতি ক্রমাগত হুমকি বৃদ্ধি পাচ্ছে। ফলে আন্তজনগোষ্ঠীর মধ্যে সম্পর্কের অবনমন ঘটছে।

দীর্ঘ সময় ধরে বার্মার সেনাবাহিনী রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে শত্রুতা দেগে আসছে। কেবল তা-ই নয়, এটুকুতেই তারা থেমে থাকেনি। তারা রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর নাগরিক ও আইনি অধিকারও কেড়ে নিয়েছে। এই ঘটনাও কম দিন আগের কথা নয়। ১৯৮০ সাল কিংবা তারও কিছুদিন আগে থেকে বার্মার সেনাবাহিনী এই কাজ করেছে। কিন্তু তখনকার সময়ে ভেতরে ভেতরের এসব কর্মকাণ্ড কারও চোখে ধরা পড়েনি। রোহিঙ্গাদের বিরুদ্ধে পরে তারা এসব নির্যাতন-পীড়ন বিপুলভাবে বাড়িয়েছে। বিশেষ করে ২০১২ সালের ঘটনার কথা উল্লেখযোগ্য। সেবছর বৌদ্ধধর্মের মানুষদের দিয়ে সরকার রোহিঙ্গাদের বিরুদ্ধে প্রচার-প্রপাগান্ডা চালায়। এটি তারা করে রোহিঙ্গারা যেখানে বসবাস করে আসছিল সেখানে গিয়ে। রাখাইনে। বৌদ্ধধর্মাবলম্বীরা সেখানে গিয়ে রোহিঙ্গাদের ডেকে রোহিঙ্গা 'মুসলিম জাতি' কাহাকে বলে তা 'শেখায়'। সেনাবাহিনী বড় কোনো বাধা ছাড়াই তাদের প্রচার-প্রপাগান্ডার যুদ্ধে জিতে যায়। এই জেতার ফলে সেনাবাহিনী সেখানে নিজেদের খুব শক্তিশালী ভূমি পেয়ে যায়। এতে তারা একটি দুষ্টচক্রের মধ্যে রোহিঙ্গাদের আবদ্ধ করতে সক্ষম হয়। এরই ফলে শেষমেশ তারা রোহিঙ্গাদের তাদের বসবাসের ভূমি থেকে সম্পূর্ণ উচ্ছেদ করতে সক্ষম হয়। এমন জঘন্য কাজে তারা নাগরিক অধিকারকর্মীদের প্রতিবাদের বাধাও পায় না; কারণ, সে ব্যবস্থা তারা আগেই সেরে রেখেছিল। দীর্ঘদিন ধরে সেনাবাহিনী তার পূর্বপরিকল্পনা ধাপে ধাপে বাস্তবায়ন করে ফেলতে পারায় এই অন্যায়ের প্রতি নাগরিকদের দুর্ভাগ্যজনক সম্মতিগুলো আগে থেকেই তৈরি ছিল।

তবে এই প্রপাগান্ডা যুদ্ধের শুরুতে ব্যতিক্রমী কিছু করার সুযোগ ছিল। সু চি তখন এই নাশকতামূলক কাজের বিরুদ্ধে লড়াই করতে পারতেন। সু চি এই মেকি গল্পগুলো রুখে দিতে পারতেন। সেনাবাহিনী প্রায় বিনা বাধায় যেসব জঘন্য কাজ নিরন্তর করে যাচ্ছিল, সেসব নিকৃষ্ট কাজের বিরুদ্ধে সু চি চাইলে কঠোর প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারতেন। সু চি এর কিছুই করলেন না। ফলে রোহিঙ্গারা প্রাণ বাঁচাতে বার্মা থেকে বাংলাদেশে আশ্রয় নিতে বাধ্য হলো। বরং ব্রিটিশরা চলে যাওয়ার পর দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোতে যে বিভাজনগুলো হয়েছে, সেখানে রোহিঙ্গারা রাখাইনের (পুরোনো আরাকান) অঞ্চলে বেশ দীর্ঘ সময় ধরে বসবাস করে আসছিল। ব্রিটিশদের কাছ থেকে বার্মা স্বাধীনতা লাভের সময় এই আরাকান অঞ্চলটি বার্মার সঙ্গে যুক্ত করে দেওয়া হয়। কিন্তু সেনাবাহিনীর প্রপাগান্ডা-যুদ্ধের সময়ে সু চি ছিলেন অদ্ভুতভাবে নিষ্ক্রিয়। সেনাবাহিনী যখন পরিকল্পিতভাবে রোহিঙ্গাদের সম্পর্কে বিকৃত প্রতিচ্ছবি নির্মাণ করছিল এবং অন্যদের রোহিঙ্গাদের বিরুদ্ধে সহিংসতায় লেলিয়ে দিচ্ছিল, তখন সু চি কিছুই করেননি। অবস্থা দেখে মনে হবে যে, সু চি সেনাবহিনীর বিরুদ্ধে কার্যকর কোনো ধরনের চেষ্টাই করতে পারলেন না? আশ্চর্য! এটি কোনোভাবেই বিশ্বাসযোগ্য নয়। সু চির নিজের হাতে তো রাজনৈতিক দল ছিল, তার মিত্ররা ছিল। আর তা ছাড়া এমন প্রতিবাদ-প্রতিরোধ তিনি অতীতে অনেকবারই করে এসেছেন। গণতান্ত্রিক আন্দোলনের সময় বার্মার মূল্যবোধগুলো তিনি কীভাবে উর্ধ্বে তুলে ধরেছেন, সেটির তো আমরা সবাই প্রত্যক্ষ স্বাক্ষী। কিন্তু এক্ষেত্রে সু চির সিদ্ধান্তটি ছিল অত্যন্ত নির্মম। সু চি ক্ষুদ্র জাতিসত্তার অপমান-অপদস্থতার বিরুদ্ধে কিছু না করার সিদ্ধান্ত নিলেন। অথচ ঘটনাটি এমন এক সময়ের সন্ধিক্ষণে ছিল যে তিনি চাইলেই এর বিরুদ্ধে কঠোর প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারতেন। প্রতিরোধের জন্য সব রসদ

তাঁর হাতের নাগালেই ছিল। কিন্তু সু চি সে সন্ধিক্ষণটি হাতছাড়া করে ফেললেন। অবশ্য সু চি পরে চেয়েছিলেন প্রতিবাদ জানাতে, কিন্তু তখন আর সময় ছিল না। ততদিনে অনেক দেরি হয়ে গেছে।

অল্প কয়েক বছরের মধ্যে সরকারি প্রচার-প্রপাগান্ডার চাতুর্যপূর্ণ বাস্তবায়নের ফলে নাগরিক মতামতগুলো এতটাই বদলে যায় যে রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর পক্ষে কেউ কথা বললে তার কঠোর বিরুদ্ধাচরণ একটি নিত্যঘটনায় পরিণত হয়। বিশেষ করে বার্মার বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের পক্ষ থেকে এই প্রতিবাদ বেশ জোরালো। এসবের ফলেবর্তমান পরিস্থিতিতে রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর সংজ্ঞা নিরূপণই বেশ কঠিন হয়ে পড়েছে। কঠিন করার এই কাজটি সেনাবাহিনী নিশ্চিত করে ছেড়েছে। প্রপাগান্ডা চালিয়ে রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীকে পর্যুদস্ত করার পর সু চি যদি রোহিঙ্গাদের পক্ষে দাঁড়াতেও চাইতেন, তাহলে সেটি হতো বার্মায় তার রাজনৈতিক নেতৃত্বের জন্য হুমকিস্বরূপ। বর্তমান বাস্তবতায় এ কথাটি আমি নিজেও স্বীকার করব। যদিও আমার নিজের মনে বার্মার জনগণের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ রয়েছে। সু চি ও অন্যান্য জাতীয় নেতৃবৃন্দ রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর বিপর্যয়কর এই পরিণতির দায় কিছুতেই এড়াতে পারবেন না। সামনের দিনগুলোতেও তাঁকে ক্রমাগত এটির মুখোমুখি হতে হবে। পরিস্থিতির পূর্ণাঙ্গ বিশ্লেষণ করলে বের হবে যে, কোন সময়ে কীভাবে তিনি এ পরিস্থিতি থেকে বের হওয়ার সুযোগ পাবেন।

উদ্ভূত পরিস্থিতি থেকে শিক্ষণীয় যদি কিছু থেকে থাকে, তবে, সেটি কেবল নৈতিক ও নীতিশাস্ত্রের বিষয় নয়। এগুলো তো রয়েছেই। বরং একইসঙ্গে এটি রাজনৈতিক প্রজ্ঞার বিষয়। এবং এ বিষয়টি অবশ্যই প্রকাশ্য যুক্তিপ্রয়োগের ব্যর্থতা। এখানে যেহেতু বিশেষভাবে নির্বাচিত নির্দিষ্ট ঘৃণা উসকে দেওয়ার বিষয় কাজ করেছে, আজকের দুনিয়ায় ইউরোপ থেকে ভারত পর্যন্ত সবখানেই এই জঘন্য কাজটি চালানো হচ্ছে। ফলে সময় ও পরিস্থিতির বিশেষ গুরুত্ব ক্রমেই বেড়ে গেছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের তিক্ত অভিজ্ঞতার পর পৃথিবীর সমাজগুলোর মধ্যে সম্পর্কের নবতর বন্ধন সৃষ্টি ও তাদের দূরত্ব ঘোচানোর জন্য অনেক উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। আমার ব্যক্তিজীবনেও আমি বিচ্ছিন্ন সম্পর্কগুলো জোড়া লাগানোর জন্য অনেক চেষ্টা করেছি। প্রচণ্ড অসহিষ্ণুতার বাতাবরণের বিরুদ্ধে ব্যক্তিগতভাবেও আমি অনেক উদ্যোগ নিয়েছি। আমার প্রচণ্ড ভয় হয়, অসহিষ্ণুতার এই অপ্রতিরোধ্য গতি সম্মিলিতভাবে আমাদের সবার তিল তিল করে শ্রম ও যত্নে-কষ্টে গড়ে তোলা এই বন্ধনগুলোকে একটানে ছিড়ে ফেলবে? আর আমার প্রিয় বার্মাকেই হতে হবে তার দৃষ্টান্ত? পৃথিবীর অন্যান্য দেশেও কিন্তু এই সংকট ঘণীভূত হচ্ছে।

আট.

স্কুলে ভর্তি হওয়ার আগে আমি কিছুটা গৃহশিক্ষা পেয়েছিলাম বার্মায় আমার ছেলেবেলার সময়টায়। ঢাকায় ফেরত এসেই আমার বিদ্যালয়কেন্দ্রিক প্রাথমিক শিক্ষা শুরু হয়। আমি ভর্তি হই সেন্ট গ্রেগরি স্কুলে। স্কুলটি ছিল পুরান ঢাকার লক্ষ্মীবাজারে। স্কুলটা আমাদের ওয়ারির বাসার বেশি দূরে ছিল না। সেন্ট গ্রেগরি ছিল একটি মিশনারি স্কুল। যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক একটি ফাউন্ডেশনের মাধ্যমে চলত স্কুলটি। কিন্তু সেন্ট গ্রেগরি সম্পর্কে এমন সোজাসাপ্টাভাবে জ্ঞান তখন আমার ছিল না। এখন কোনো গৌরবর্ণের শিক্ষককে দেখেই বুঝতে পারি যে তিনি আমেরিকান ইংরেজ কিনা; কিন্তু তখন আমাদের চোখ এমন পরিপক্ক ছিল না। ফলে ছেলেরা তাদের বেলজিয়ামের শিক্ষক ভাবত। আমার সহপাঠীরা কেন এমনটি ভাবত, তা এখন আর আমার মনে নেই। বিদ্বৎসমাজে সেন্ট গ্রেগরি ছিল একটি গুণী প্রতিষ্ঠান। প্রধান শিক্ষক ব্রাদার জুড শুধু শিক্ষার গুণগত মান নিয়েই মনোযোগী ছিলেন না, বরং বার্ষিক পরীক্ষার ফলাফলে সে অঞ্চলের অন্য সব স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে কেবল গ্রেগরীয়দের ফলই যেন সবচেয়ে উজ্জ্বল হয় তা তিনি নিশ্চিত করে ছাড়তেন। ২০০৭ সালে সেন্ট গ্রেগরি স্কুলের ১২৫তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর সংখ্যায় স্কুলের পুরোনো দিনগুলোর

স্মৃতিচারণায় ব্রাদার জুডের কথায় তার রেশ পাওয়া যায়: 'আমাদের ছেলেরাই প্রথম থেকে দশম স্থানগুলো দখল করে আছে, এবং এটি প্রতি বছরই হচ্ছে, ভবিষ্যতেও এভাবে চলবে।' অবশ্য কিছু গ্রেগরীয় ছাত্রছাত্রী সত্যিই নামকরা বিদ্যাবেত্তা ও বিখ্যাত আইনজীবী হতে পেরেছিলেন। এমনকি বড় রাজনৈতিক নেতাও হতে পেরেছিলেন। তাঁদের মধ্যে একজন বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতিও হয়েছিলেন। কামাল হোসেন বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর প্রথম পররাষ্ট্রমন্ত্রী হন। কামাল হোসেনও সেন্ট গ্রেগরি স্কুলের ছাত্র। কামাল হোসেন স্কুলের ভালো ফলাফলের পেছনে নিবেদিতপ্রাণ শিক্ষকদের কঠোর পরিশ্রমের কথা বলেছেন। শুধু তা-ই নয়, তিনি আরও বলেছেন, শিক্ষার্থীদের সাহায্যে যথাসম্ভব সবকিছু করতেই শিক্ষকেরা প্রস্তুত থাকতেন। শিক্ষকগণ শ্রেণিকক্ষের ভেতরে যেমন ছাত্রছাত্রীদের জন্য প্রচুর পরিশ্রম করতেন, তেমনি শ্রেণিকক্ষের বাইরেও তাদের প্রয়োজনে অসাধারণভাবে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিতেন।

কিন্তু হতাশার সঙ্গে বলতে হচ্ছে, সেন্ট গ্রেগরি স্কুলের কঠিন সব শৃঙ্খলা ও সর্বোচ্চ ফলাফলের এই সংস্কৃতি আমার তেমন মনের মতো ছিল না। বিষয়টি যত সোজা মনে হয়, বাস্তবে তেমনটি ছিল না। স্কুলের এই চর্চাটি আমার কাছে বেশ আঁটোসাঁটো মনে হতো। ফলে আমি একটি উজ্জ্বল তারকা ছাত্রের মতো দীপ্তি ছড়ানোর রূপকল্পে আমার নিজেকে দেখতে চাইতাম না। অন্তত প্রধান শিক্ষক ব্রাদার জুডের চোখে তো নয়ই। অনেক বছর পরে আমি নোবেল পুরস্কার পাওয়ার পর ১৯৯৮ সালের ডিসেম্বরে অল্প সময়ের জন্য ঢাকায় বেড়াতে গেলে সেন্ট গ্রেগরি স্কুলের সেসময়ের প্রধান শিক্ষক আমার জন্য একটি বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন। অনুষ্ঠানে প্রধান শিক্ষক বক্তৃতায় বলেন, তিনি এই আয়োজনটি করেছেন বর্তমান ছাত্রছাত্রীদের অনুপ্রেরণা দেওয়ার জন্য। এই কথা বলে বহু পুরোনো বস্তা থেকে আমার পরীক্ষার খাতা বের করে সবার সামনে দেখালেন। এই কাণ্ড দেখে আমি তো একেবারে থ! অবশ্য আমার খাতাটি দেখিয়ে উচ্ছ্বসিত হওয়ার বদলে খানিকটা দমে যেতে হলো তাঁকে। কারণ, আমার সেই খাতার প্রাপ্ত নম্বর অনুযায়ী ফলাফল তাঁকে আপ্লুত করতে ব্যর্থ হলো। কারণ, 'ক্লাসের মোট ৩৭ জন ছাত্রছাত্রীর মধ্যে আমার মেধাক্রম ছিল ৩৩তম।' কিন্তু তা সত্ত্বেও আমার প্রতি উষ্ণ হৃদয় নিয়ে বলেছিলেন যে, 'আমার মনে হয় আপনি সেন্ট গ্রেগরি ছাড়ার পরপরই ভালো ছাত্র হয়ে উঠেছিলেন!' প্রধান শিক্ষক মহোদয় অবশ্য ভুল কিছু বলেননি। আমার মনে হয় আমি তখনই ভালো ছাত্র হয়ে উঠেছিলাম, যখন ভালো ছাত্র হয়ে ওঠার পরোয়া কেউ করত না।

ঢাকায় স্কুলজীবনের বছরগুলোতেও আমি শান্তিনিকেতনে নিয়মিত বিরতিতে বেড়াতে যেতাম। ব্যাপারটা এমন ছিল না যে মন চাইল শান্তিনিকেতনে চললাম, নইলে নয়। শান্তিনিকেতনে বেড়ানোটা ছিল একেবারে নিয়মিত। তাতে কোনো ছেদ ঘটত না। কিন্তু পরবর্তী সময়ে আমার লেখাপড়ার জন্য স্থায়ীভাবে শান্তিনিকেতনে স্থানান্তরিত হওয়ার কোনো লক্ষণ তখনো তৈরি হয়নি। অন্তত ঢাকার জীবনের শুরুর দিনগুলোতে তো নয়ই। যা হোক, ১৯৪১ সালে জাপানি সৈন্যরা বার্মা দখল করলে বাবা-মা আমাকে শান্তিনিকেতনে নানাবাড়ি পাঠিয়ে দেন এবং সেখানেই স্কুলে ভর্তি করান। আব্বা অবশ্য চাইতেন আমি সেন্ট গ্রেগরিতেই পড়াশোনা করি। কারণ, তুলনামূলকভাবে সেন্ট গ্রেগরি ছিল অনেক ভালো স্কুল। স্কুলের ফলাফল ছিল সবার চেয়ে সেরা এবং যেকোনো বিচারেই স্কুলটি ছিল উৎকৃষ্ট মানের। কিন্তু বিকাশমান পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে আব্বার মনে হতে থাকে, জাপানি সেনারা যখন ঢাকা ও কলকাতায় বোমা বর্ষণ করতে শুরু করবে, তখন শান্তিনিকেতনের মতো শহর থেকে এতটা দূরবর্তী স্থানে বোমা ফেলার আগ্রহ হারিয়ে ফেলার সম্ভাবনাই বেশি।

সুখের কথা হলো জাপানী সৈনিকদের আক্রমণের পরিধি সম্পর্কে আব্বার মূল্যায়ন সঠিক ছিল। যুদ্ধের সেই বছরগুলোতে ঢাকা ও কলকাতা উভয় শহরেই নিয়মিত বোমা বর্ষণ হতো। ফলে বিকট শব্দে মুহুর্মুহু সাইরেন

বাজানো হতো। কারণ, বোমা বর্ষণের সময় মানুষকে বাঁচাতে যেন অন্যত্র সরিয়ে নেওয়া যায়। বোমা বর্ষণের একটি ঘটনা আমার মনে আছে। শান্তিনিকেতনে পড়ার সময়ে আমি ও আমাদের পরিবারিক বন্ধুরা মিলে ছুটি কাটানোর জন্য কলকাতায় নদীর ধারে বেড়াতে গেলে বোমা বর্ষণের মধ্যে পড়ে যাই। সেটিতে অল্প সময়ের জন্য হলেও আমরা খুব ঘাবড়ে গিয়েছিলাম। ১৯৪২ সালের ডিসেম্বর মাসের সেই এক সপ্তাহে কলকাতা শহরে জাপানিরা পাঁচ দফা বোমা বর্ষণ করে। এ সময় নদীর ধারগুলোও বাদ যায়নি। এক সন্ধ্যার কথা মনে পড়ে। সন্ধ্যা নামতেই আমার বিছানায় যেতে হয়েছিল। আমি দ্রুত ঘুমিয়ে পড়েছি—মিছিমিছি এমন ঘুমের ভান করছিলাম, এভাবে সবার চোখ ফাঁকি দিয়ে বাসার তিন তলার বারান্দায় উঁকি দিয়ে দূরে বোমা বর্ষণের কারণে দাউ দাউ করে জ্বলতে থাকা আগুনের আভা দেখেছি। যদিও ঘটনাস্থলটি আমাদের বাড়ি থেকে বহুদূরে ছিল, কিন্তু আমার মতো বাচ্চা ছেলের কাছে সেটি ছিল অত্যন্ত উত্তেজিত হওয়ার মতো ঘটনা। কলকাতায় বোমা বর্ষণ হলেও সৌভাগ্যবশত ঢাকায় বোমা বর্ষণ হয়নি।

শান্তিনিকেতনে আমার স্কুলজীবন শুরুর কারণ ছিল আব্বার যুদ্ধদিনের যুক্তি প্রয়োগ। উদ্ভূত এই বিশেষ পরিস্থিতিতে আব্বার যুক্তিনির্ভর বিশ্লেষণের ফলাফল হলো—ঢাকায় সেন্ট গ্রেগরি স্কুলের পাট চুকিয়ে শান্তিনিকেতনের স্কুলে প্রাতিষ্ঠানিক বিদ্যাচর্চার সূচনা। নতুন স্কুলের শেষ দিকে এর প্রগতিশীল চিন্তাধারার কারণে শান্তিনিকেতন প্রতিষ্ঠানটিকে আমার ভীষণ ভালো লেগে যায়। শান্তিনিকেতন ছিল অত্যন্ত ব্যতিক্রমী একটি বিদ্যাপীঠ। তারা অগ্রাধিকার নিয়ে ছিল নিরুদ্বেগ। অন্তত সেন্ট গ্রেগরি স্কুলের মতো অতটা আঁটোসাঁটো বিদ্যায়তনিক চর্চার মধ্যে তারা ছিল না। শান্তিনিকেতনের স্কুলটি ভারতে আবহমানকাল ধরে চলে আসা শিক্ষার সনাতনী নানা ধারাকে সমন্বিত করার চেষ্টা করেছে। সেখানে শিক্ষার অভিমুখটি ছিল সারা পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা দেশগুলোর শিল্প ও সংস্কৃতির সঙ্গে ছাত্রছাত্রীদের পরিচয় করিয়ে দেওয়া, ছাত্রছাত্রীদের মনে সত্যিকারের বিশ্ববীক্ষার উদ্বোধন ঘটানো। শান্তিনিকেতনে যে বিষয়টির ওপর জোর দেওয়া হতো, সেটি হলো শিশুদের মনকে কৌতূহলী করে গড়ে তোলা। শান্তিনিকেতন শিশুর কৌতূহলকে তার কল্পনার সঙ্গে যুক্ত করে নিজেকে বিকশিত করতে শেখায়। শান্তিনিকেতন তার শিক্ষার্থীদের শ্রেষ্ঠত্ব অর্জনের প্রতিযোগতায় নিপুণভাবে তৈরি করার লক্ষ নিয়ে চলত না। ফলে শান্তিনিকেতনে পরীক্ষায় ভালো ফল করার চাপ ও ভালো গ্রেড অর্জনের অভিমুখী করে শিক্ষার্থীদের তৈরি করা হতো না। কেবল তা-ই নয়,এহেন প্রতিযোগিতার প্রতি বিদ্যার্থীদের যথেষ্ঠ নিরুৎসাহিত করা হতো। শান্তিনিকেতনের উন্মুক্ত গ্রন্থাগারের বইয়ের তাকে থরেথরে সাজানো গ্রন্থগুলো যেন ছিল আমায় ঘেরা এক সমৃদ্ধ পৃথিবী। স্কুলের পরীক্ষায় আমি ভালো ফল না করায় আমি আমাকে নিয়ে খুবই সন্তুষ্ট ছিলাম। ভালো ফলের পেছনে দৌড়ঝাঁপ না করাকে আমি ভালোবেসে ফেলেছিলাম।

শান্তিনিকেতনে থিতু হওয়ার অল্পকিছুদিন পরই যুদ্ধের দামামা থেমে গেল। জাপানিরা পিছু হটলেও আমি আমার নতুন স্কুল থেকে কিছুতেই পিছু হটলাম না। বরং আমার নতুন স্কুল শান্তিনিকেতনকে ভালোবেসে ফেললাম। আমার জন্মের মুহূর্তটুকুর মাধ্যমে শান্তিনিকেতনের সঙ্গে আমার নাড়ির বন্ধন স্থাপিত হয়েছে। আমার জীবনের সুদীর্ঘ সময়ের ভালোবাসার ঘর হলো শান্তিনিকেতন। কিন্তু শান্তিনিকেতনে থাকলেও ঢাকায় আব্বার কর্মস্থলে—ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আমাকে নিয়মিত যেতে হতো। সেখানে আমার বাবা-মা ও ছোট বোন মঞ্জু সুখে-শান্তিতে দিন কাটাতেন। স্কুলের পড়াশোনার জন্য শান্তিনিকেতনে থাকা এবং দীর্ঘ ছুটিতে ঢাকায় যাওয়া—এ দুটির সমন্বয় আমার জন্য ছিল আদর্শ সংমিশ্রণ। আমার চাচাতো ভাইবোনেরা বিশেষ করে মিরাদি (মিরা সেন, পরে মিরা রায়) আমার ছুটির দিনগুলোকে আনন্দে ভরিয়ে দিত।

সাতচল্লিশের দেশভাগ আমার জীবনের আনন্দঘন এই পরিবেশকে উল্টেপাল্টে দেয়। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ও নিষ্ঠুর রক্তপাত মানুষের মনকে বিষণ্ন ও দুঃখাতুর করে তোলে। পরিস্থিতি আমাদের বলে যে আমাদের

এখান থেকে চলে যাওয়া দরকার। ঢাকা তখন সদ্য জন্ম নেওয়া পূর্ব পাকিস্তানের রাজধানীতে পরিণত হয়েছে। তখন আমাদের পরিবার বসবাসের জন্য শান্তিনিকেতনকে বেছে নিতে বাধ্য হয়। আমি শান্তিনিকেতন ভালোবাসলেও ঢাকাকে বড় বেশি অনুভব করি। বিশেষ করে আমাদের বাড়িটি—জগৎ কুটির। পল্লবিত ছায়াঘেরা চম্পা গাছটি আমাদের ঢাকার বাড়িটির উপর তলার বারান্দাকে সুগন্ধে ভরিয়ে রাখত—সেই গাছটি আমার জীবন থেকে হারিয়ে গেছে। ঢাকায় আমার খেলার পুরোনো বন্ধুরা কে কোথায় আছে জানি না। আমি মনে মনে তাদের খোঁজ করি। আমাদের বাড়ির বাগানের আম-কাঁঠালের গাছগুলো কোথায় গেল? সেগুলো এখন কোথায় আছে? মোট কথা, আমার পৃথিবীটাকে আমি হারিয়ে ফেলেছি। বিলুপ্ত আমার ঢাকাকে কি কেউ এখন পূরণ করে দিতে পারবে? আমার জীবন ঢাকায় কিংবা শান্তিনিকেতনে যেমনটি ছিল, সেটি কি আমি আর কখনো ফিরে পাব? নতুন জীবন শুরু করে আমি দ্রুতই আবিষ্কার করি, পুরোনো যা-কিছু নিয়ে আমার হারানোর বেদনা রয়েছে, তাকে আমি আমার জীবন থেকে বাদ দিয়ে দিতে পারছি না।

বাঙলার নদী

এক.

প্রমত্ত পদ্মা নদী থেকে ঢাকা খুব বেশি দূরে নয়। সুপ্রসিদ্ধ ও বিখ্যাত গঙ্গা নদীর যে দুটি বড় শাখানদী রয়েছে পদ্মা হলো তার একটি। ইংরেজি ভাষাভাষীর মানুষজন গঙ্গা নদীকে 'দ্য গেঞ্জেস' বলেন। গঙ্গা নদীটি বাঙলা অঞ্চলে প্রবেশ করে দুই ভাগে ভাগ হয়ে যায়। অতীতে উত্তর ভারতের প্রাচীন শহরগুলো, যার মধ্যে বেনারস ও পাটনার মতো ঐতিহ্যবাহী পুরোনো শহর অন্তর্ভুক্ত ছিল, সেগুলোর সবই বৃহত্তর বাঙলার অন্তর্ভুক্ত ছিল। 'পদ্মা' সংস্কৃত ভাষার শব্দ, যা পরে বাংলা ভাষায় অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। 'পদ্মা' শব্দটির উদ্ভব একটি ফুলের নাম 'পদ্ম' থেকে। পদ্মা নদী বঙ্গোপসাগরে শেষ হওয়ার আগে দক্ষিণ-পূর্ব দিকে আয়াস ও অলস ভঙ্গিতে নিজেকে প্রসারিত করেছে। গঙ্গার অন্য শাখাটির নাম হলো ভাগিরথী। ভাগীরথী নদী অবশ্য পদ্মার মতো অতোটা আয়াস করতে পারেনি। সে সোজাসুজি দক্ষিণে প্রবাহিত হয়েছে। তার চলার পথ এতই সোজা দিকে যে, সে সরাসরি কলকাতা শহরের উপর দিয়েই চলে গেছে। বঙ্গোপসাগরে গিয়ে নিজের সমাপ্তি ঘোষণা করলেও তাকে ঘুরতে হয়েছে কম। অল্প পথ অতিক্রম করেই সে বঙ্গোপসাগরের দেখা পেয়েছে। আমি বলতে পারব না, কীভাবে যেন ভাগীরথীর ছোট্ট একটি শাখার নাম মূল নদী 'গঙ্গা'র নামেই নামকরণ হয়ে গেছে এবং বিভিন্ন স্থানে ভাগীরথী ও 'গঙ্গা' তাদের নাম অদল-বদল করে প্রবাহিত হয়েছে। সম্প্রতি এদের কোনো কোনো অংশকে হুগলী নদী বলে। বাংলা সাহিত্যে ভাগীরথী ও পদ্মা নদী বেশ বড় পরিসর নিয়ে আছে। ভাগীরথী ও পদ্মা—কোনটির মাহাত্ম্য বেশি—তা নিয়ে রেশারেশি আছে। আমার মনে পড়ে, আমরা তখন ঢাকায় থাকি; ঢাকার বালক হিসেবে পদ্মা নদীকে আমার পদ্ম ফুলের মতো সুন্দর লাগে—এ কথা বলায়, আমার কলকাতার বন্ধুটি গাল ফুলিয়ে আমার সঙ্গে কথা বলাই বন্ধ করে দিয়েছিল।

গঙ্গার জলের বণ্টনের বিষয়টি অবশ্য এমন তুলতুলে নরম ব্যাপার নয়। এটি খুবই মারাত্মক বিষয়। শুধু তা-ই নয়, এটি তীব্রভাবে রাজনৈতিক ব্যাপারও। এই রাজনৈতিক তীব্রতার বিষয়টি গতি পেয়েছে যখন ভারত সরকার গঙ্গা নদীতে বিশাল বাঁধ নির্মাণ করল। ১৯৭০ সালে ভারত গঙ্গা নদীতে ফারাক্কা বাঁধ নির্মাণ করে। এই বাঁধ নির্মাণের প্রধান লক্ষ্য ছিল গঙ্গার জল প্রত্যাহার করে ভাগীরথী নদীর জলকে আরও

বাড়িয়ে তোলা। ফারাক্কা বাঁধ নির্মাণের আরও একটি প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। সেটি হলো কলকাতা বন্দরে জমতে থাকা পলির কারণে জাহাজ ভিড়তে যে সমস্যা হয়, তা দূর করা। অর্থাৎ পলি পরিষ্কার করা। কিন্তু বাঁধ নির্মাণ করেও বন্দরের পলি জমা সমস্যার সমাধান করা গেল না। কিন্তু এর ফলাফল হলো ভয়াবহ। ফারাক্কা বাঁধ নির্মাণের ফলে পূর্ব বাঙলার মানুষদের নিজেদের মধ্যে অকল্পনীয় শত্রুতা সৃষ্টি হলো। আমার ছেলেবেলায় আমি এতটা রাজনৈতিক কলহ দেখিনি। বরং এসব একটু দূরের বিষয়ই ছিল। কিন্তু বাঁধ নির্মাণের পর জল নিয়ে শত্রুতা কঠিন থেকে কঠিনতর হয়ে উঠছিল।

পদ্মা নদী নিয়ে আমার গর্বের কোনো ভিত্তি আসলে ছিল না। কারণ, প্রকৃকপক্ষে ঢাকা তো পদ্মা নদীর তীরে অবস্থিত ছিল না। কথিত আছে, কিছু মানুষ বিশ্বাস করে যে, পদ্মার তীরে ঢাকা গড়ে উঠেছিল, কিন্তু সেটি কয়েক শত বছর আগের কথা। পদ্মা নদীর গতিপথ সেখান থেকে অনেকটা সরে গেছে। বাঙলার অসাধারণ নরম পলিমাটি গুণের কারণে নদ-নদীগুলো তাদের চলার পথ সহজে পরিবর্তন করার 'নরম' সুযোগটির সদ্ব্যবহার করতে পেরেছে। এই সুযোগের ব্যবহার সে করে থাকে যতটা না ঐতিহাসিক কারণে, তার চেয়েও অনেক বেশি—মাটির বৈশিষ্ট্য ও সময়ের বিশেষ বাঁকের কারণে। বর্তমানে ঢাকা অনেক ছোট একটি নদীর তীরে দাঁড়িয়ে আছে। এই ছোট্ট নদীটির নাম বুড়িগঙ্গা। বুড়িগঙ্গা শব্দটির অর্থ হলো সে গঙ্গা নদীর বড় বোন। অবশ্য বুড়িগঙ্গা শব্দ দিয়ে এটিও বোঝায় যে, বড় এই বোনটির বেশ বয়স হয়ে গেছে—বয়সে সে এখন একজন বুড়ি। ঢাকা থেকে পদ্মা নদী দেখতে যেতে লম্বা ভ্রমণের প্রয়োজন নেই। অল্প ভ্রমণেই অপূর্ব পদ্মা নদীটি দেখতে পাওয়া যাবে। পদ্মা নদী শহরকে বিদায় জানিয়ে যতই অগ্রসর হয়েছে, ততই তার অপার সৌন্দর্য ধীরে ধীরে উন্মুক্ত করতে শুরু করেছে। কারণ, কখনোকখনোসে তার উপ নদ-নদীগুলোর ঘাড়ে হাত রেখে গলাগলি করে চলতে থাকে। চলতে চলতে পদ্মা যখন উপমহাদেশের সবচেয়ে বড় নদী ব্রহ্মপুত্রের হাত ধরে ফেলে এবংতার সঙ্গে মিলিত হয়, তখন এদুজনের সম্মিলিত সত্তার নতুন নাম হয় যমুনা নদী। এই নতুন নাম—যমুনা নদী—উত্তর ভারতের বাসিন্দাদের ধন্দে ফেলে দেয়। কারণ, দিল্লীর আগ্রারবিখ্যাত তাজমহলও বিখ্যাত যমুনা নদীর তীরেই অবস্থিত। কিন্তু সেই যমুনা নদী আগে থেকেই নামকরা, এটি এই নতুন যমুনা নদী নয়। যা হোক, আগের জায়গায় ফিরে যাই। পদ্মা যেখানে ব্রহ্মপুত্রের সঙ্গে মিলে যমুনা নদী নাম নিয়ে কিছুদূর এগিয়েছে, সেখান থেকে একটু নিচে নেমে পদ্মা নদী মেঘনাকে আলিঙ্গন করেছে। এই মিলনস্থলটি বিপুল ও বিশাল। আমার নিজের চোখে দেখা সেই স্থানটির কথা আমি কিছুতেই ভুলতে পারি না। এখনো আমার মনে পড়ে যে, রাজকীয় সেই বিস্তৃত জলরাশির কোনো কূলকিনারা দেখতে আমি সক্ষম হইনি। আমি এটি দেখে একেবারে অভিভূত হয়ে যাই, আর আব্বাকে জিজ্ঞেস করি—'এটি কি সত্যি সত্যিই একটি নদী?' 'আব্বা, পানিতে কী হাঙর আছে?'

পূর্ব বাঙলায় বসবাসের সময় আমাদের জীবনকে নদী আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে রেখেছিল। আমার ছোটবেলার সেই পূর্ব বাঙলা হলো বর্তমান বাংলাদেশ। যখন আমরা ঢাকা থেকে কলকাতায় যেতাম—সেটি কলকাতার বড় শহর হোক কিংবা বা শান্তিনিকেতন হোক—গন্তব্যে পৌঁছতে হলে রেলগাড়িতে আমাদের সংক্ষিপ্ত ভ্রমণ করতেই হতো। সরাসরি শেষ গন্তব্যে পৌঁছানোর কোনো ব্যবস্থা তখন ছিল না। প্রথমে ঢাকা থেকে নারায়ণগঞ্জে যেতে হতো। নারায়ণগঞ্জ পৌঁছবার পর সেখান থেকে পদ্মা নদী দিয়ে স্টিমারে করে দীর্ঘ নৌপথের ভ্রমণ করতেই হতো। পদ্মার দুই ধারের বৈচিত্র্যময় অপরূপ দৃশ্য দেখতে দেখতে কখন যে আমরা গোয়ালন্দ রেলস্টেশনে পৌঁছে গেছি, তা খেয়ালই করতে পারতাম না। এই গোয়ালন্দ রেলস্টেশন থেকে রেলগাড়িতে উঠলে সোজা কলকাতায় পৌঁছে যেতাম।

পদ্মা নদীতে এই স্টিমার ভ্রমণ আমার কাছে সবসময়ই ছিল অত্যন্ত রোমাঞ্চকর। প্রতি মুহূর্তে রূপ বদলানো বাঙলার অপূর্ব প্রাকৃতিক দৃশ্যগুলো উপভোগ না করে কোনো উপায় ছিল না। সেসব প্রাকৃতিক দৃশ্যের মধ্যেও ব্যস্ত গ্রামীণ জনপদের জীবনচিত্র চোখে পড়ে। ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা যাদের স্কুলে যাওয়ার সময় হয়নি, তারা দৌড়ে নদীর ধারে এসে আমাদের নৌযাত্রার দিকে কৌতূহল নিয়ে তাকিয়ে থাকত। এই তরতাজা আনন্দ খুঁজে পেয়ে তারা সুন্দর করে হাসত। বর্তমানে আমার মধ্যে উদ্বিগ্ন হওয়ার যে একটা বাতিক আছে, সেটি তখন কাজ করত না। সেসব ছেলেমেয়ে স্কুলে না গেলেও আমার তাদের নিয়ে কোনো চিন্তা হতো না। কিন্তু আমার আব্বা আমার মতো ছিলেন না। আব্বা আমাকে বলতেন যে, অধিকাংশ ভারতীয় শিশু স্কুলে যেতে পারে না; কারণ, যাওয়ার মতো পর্যাপ্তসংখ্যক স্কুলই নেই। ভারতে স্কুল খুব অপ্রতুল। আব্বা আমাকে বলেছিলেন যে, এমন জঘন্য পরিস্থিতির কেবল তখনই অবসান হবে, যখন ভারত স্বাধীন হবে। আব্বার এই কথা শুনে তখন আমার মনে হয়েছিল, ভারতের স্বাধীনতা সুদূরপরাহত কোনো বিষয়। তারপরও কিন্তু আব্বার কথাটা আমি বিশ্বাস করতাম। হায়! আমার তখন একবারের জন্যেও মনে আসেনি—ভারত স্বাধীন হওয়ার পরেও আগের অচলায়তনের তেমন কোনো বদলই ঘটবে না; আর সবকিছু বাদ দিলেও কেবল প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যাটাও বাড়ানো যাবে না; শিক্ষার মৌলিক গুরুত্ব সম্পর্কে জোরের বিষয়টি আমার জীবনে একটি কেন্দ্রীয় বিষয় হয়ে উঠবে; এতটা দৃঢ় অঙ্গীকার আমার জীবন আমার কাছ থেকে আদায় করে নেবে—ভারতের জন্যে তো বটেই অন্যত্রও—এমনকি স্বাধীনতা অর্জনের পরেও সেটি করতে হবে, সেটি আমি আগে বুঝতে পারিনি।

স্টিমারের সেসব ভ্রমণ আমাকে প্রকৌশলপ্রযুক্তির সঙ্গে আমার পরিচয় ঘটায়। স্টিমারের ইঞ্জিন ঘরটি দেখলে যে কারোরই নাক সিটকানোর কথা। আধুনিক যন্ত্রের তুলনায় সেটি ছিল হতাশাজনক সেকেলে। কিন্তু আমার এসবের বালাই ছিল না। আমি বরং উত্তেজিতই ছিলাম। কারণ, স্টিমারের চালক আব্বাকে সসম্মানে ইঞ্জিন ঘরটিতে বসার অনুমতি দিলে আব্বা আমাকে সঙ্গে নিয়ে সেখানে যেতেন। বলার কোনো প্রয়োজন নেই যে, এই সুযোগটি উপভোগ করার জন্য আমরা কিন্তু প্রায়ই ইঞ্জিনঘরে গিয়ে বসতাম। ইঞ্জিন চলার প্রচণ্ড শব্দ হচ্ছে, ইঞ্জিনের লোহার দণ্ডটি একবার উপরে উঠছে আর নিচে নামছে। পাশাপাশি লোহার চাকাটি কোনোরকম আব্রু ছাড়াই দৃশ্যমান। প্রচণ্ড জোরে ঘুরছে চাকাটি। ইঞ্জিনের তেল ও গ্রিজের মিলিত গন্ধ বাতাসে আলাদা একধরনের সৌরভের সৃষ্টি করে রাখে! আমার চোখের সামনে পৃথিবীজুড়ে চলমান নিরন্তর সব কর্মকাণ্ড দেখে আমি খুব আনন্দ পাই। কিন্তু আমাদের স্টিমারটি সেসব কাজের গতির সঙ্গে তাল মেলাতে পারতো না। বরং উল্টো, স্টিমারটি ধীরে ধীরে নরম পায়ে সামনে এগিয়ে যেত। আব্বা আর আমি ডেকে বসে গতিময় পৃথিবীর কর্মকাণ্ড দেখতাম। আমি এখন বুঝতে পারছি, জটিল এক পৃথিবীর স্বরূপ উন্মোচনে সেটাই ছিল আমার প্রাথমিক প্রচেষ্টা। জাহাজের ইঞ্জিন কীভাবে কাজ করে—সেই জটিলতর বিষয়টি আমাকে বাস্তব দুনিয়ার জটিলতা বুঝতে মসকো করিয়েছে।

দুই.

নৌপথে গোয়ালন্দ ঘাট থেকে যাত্রা শুরু করে আবার ফেরার সময় গোয়ালন্দেই ফিরে আসা হলো আমার নদীকেন্দ্রিক শৈশবের বাস্তব অভিজ্ঞতার একমাত্র ও অবিচ্ছেদ্য অংশ। পূর্ব বাঙলায় বর্ষা ঋতুতে বিভিন্ন ছুটির দিনগুলোর বেশিরভাগই ছিল ভেজা ভেজা। দিনগুলো ছিল জলময়। ঢাকা থেকে দাদাবাড়ি মানিকগঞ্জের মত্ততে বিভিন্ন নদ-নদীর সর্পিল পথ ধরে নৌকায় করে ছোটবড় খাল-বিল পাড়ি দিয়ে যাত্রাপথের অভিজ্ঞতাটি কেমন ছিল, সেটি আমি এই বইয়ের আগের অংশেই বর্ণনা করেছি। ওইটুকু পথ পাড়ি দিতে কত লম্বা সময়ই না লেগে যেত! আব্বা-আম্মা ও ছোটবোন মঞ্জুসহ আমরা যখন বিক্রমপুরের

সোনারঙে নানাবাড়ি যেতাম, তখনও দাদাবাড়ি যাওয়া কাহিনীর পুনরাবৃত্তি হতো। পূর্ব বাঙলায় ঢাকার বেশ কাছেই ছিল বিক্রমপুর। কিন্তু কাছে হলেও নদীপথের সেই যাত্রায় কত যে খাল-বিল নদী-নালা পাড়ি দিয়ে সেখানে পৌঁছতে হতো তার কোনো হিসেব নেই। আমার নানা-নানি পশ্চিমবঙ্গের শান্তিনিকেতন থেকে সোনারঙে নিয়মিত যাতায়াত করতেন। সোনারঙ ছিল আমার নানার পূর্বপুরুষদের বাড়ি। অর্থাৎ আমার নানার 'মূল গ্রামের বাড়ি' ছিল এই সোনারঙ গ্রামে। আমার নানার কর্মস্থল ও বসবাসের জায়গা ছিল শান্তিনিকেতনে। নানার পৈত্রিক বাড়ি সোনারঙ হলেও বাস্তবে আমার নানা তাঁর পরিবার নিয়ে সোনারঙ গ্রামে বাস করতেন না। তিনি থাকতেন সেখান থেকে বহুদূরে, শান্তিনিকেতনে। কিন্তু তা সত্ত্বেও আমার নানা—বাড়ি বলতে সোনারঙই বুঝতেন।

আমার যখন বয়স প্রায় নয় বছর, তখন আব্বা আমাকে বলেছিলেন যে স্কুলের গ্রীষ্মের ছুটিতে তিনি একটি নৌকাঘর ভাড়া করবেন। বাঙলার সমস্ত অঞ্চলজুড়ে জালের মতো নদী-নালার যে বিস্তৃত অন্তর্জাল, তার সৌন্দর্য উপভোগ করতে গ্রীষ্মের ছুটির এক মাসেরজন্য ঘুরে বেড়াতে তিনি নৌকাঘরটি ভাড়া করতে চান। নৌকাটিতে একটি ছোট ইঞ্জিন লাগানো ছিল। আব্বার প্রস্তাব শুনে আমার মনে হয়েছিল যে আমার জীবনের সবচেয়ে স্মরণীয় মুহূর্তটি আসতে চলেছে। আসলে হয়েছিলও তাই। সেই এক মাসে আমার দুর্লভ মুহূর্তগুলো—আমি যা আশা করেছিলাম, তার চেয়েও রোমাঞ্চকর ছিল। আমার মনে পড়ে, সেই দিনগুলোর কথা। নৌকাটি ধীরে ধীরে আমাদের শরীরে শিহরণ জাগিয়ে এগিয়ে চলত। সময়টি যেমন রোমাঞ্চকর হবে বলে আশা করেছিলাম, ঠিক তেমনই শিহরণজাগানিয়া ছিল। মাসব্যপী নদীবাসের প্রথমেই আমরা পদ্মা নদী দিয়ে আরম্ভ করি। পদ্মা নদীতে মনভরে ভ্রমণ শেষ করে আমরা অন্য নদীতে যাত্রা করি। আমরা ধলেশ্বরীর কমনীয়তা উপভোগ করতে করতে সর্ববৃহৎ ও সুন্দর মেঘনার বুকে চলে আসি। নদীতে কাটানো আমাদের যাপিত জীবনের সেসময়টির কথা আমি বলে বোঝাতে পারব না। সব মিলিয়ে সময়টি ছিল নতুন নতুন রোমাঞ্চে টইটম্বুর। আনন্দে একেবারে পরিপূর্ণ। বিস্তীর্ণ জলরাশির দিকে তাকালে কেবল জলের প্রান্তের গাছগাছালিই চোখে পড়ত না, বরং জলের তলায়ও নানা ধরনের উদ্ভিদ চোখে পড়ত। জলের নিচের উদ্ভিদগুলো আমার কাছে ছিল অপরিচিত; কারণ, আমি আগে এগুলো কখনো দেখিনি। নৌভ্রমণে মাঝেমধ্যে আমাদের মাথার উপর পাখিরা বৃত্তাকারে ঘুরত, কখনোকখনো তারা নৌকায় এসেও বিশ্রাম নিত, এই দৃশ্যে আমার চোখ জুড়িয়ে যেত। পাখিগুলোর দিক থেকে আমি আমার চোখ সরাতে পারতাম না। পাখিগুলোর মধ্যে কতকগুলোর নাম আমার জানা ছিল, সেগুলো আমি আমার পাঁচ বছর বয়সী ছোট্ট বোন মঞ্জুকে বলতাম। পাখির নাম শুনে মঞ্জু খুব খুশি হতো। সে হাসত। নদী তার জলের কলধ্বনিতে আমাদের আবদ্ধ করে রাখত। মনে হতো, যেন নদী আমাদের সঙ্গে কথা বলছে। নদীর এই পরিবেশটি ঢাকায় আমাদের বাড়ির শান্ত-নীরব বাগানটির ঠিক বিপরীত। নদীতে ঝড়ো বাতাসের সময় একটু বড় আওয়াজ তুলে জলরাশি আমাদের নৌকার প্রান্তে বাধা পেয়ে ছলকে উঠত। নদীর স্বচ্ছ জলরাশি ময়ূরের মতো পেখম মেলে আমাদের চোখেমুখে পরশ বুলিয়ে শিহরণ জাগাত।

সে সময় নদীতে যেসব মাছ দেখার সৌভাগ্য হয়েছিল, সেগুলো আগে আমার চোখে পড়েনি। আব্বা আমাকে সেসব মাছের নাম বলে দিতেন। শুনে আমার মনে হতো, আব্বা পৃথিবীর সবকিছুই জানেন। শুধু নাম কেন, আব্বা সেই মাছগুলোর প্রতিটির বিশেষ বৈশিষ্ট্যগুলোও আমার নজরে আনতেন। তখন নদীতে ছোট ছোট ডলফিন থাকত, যারা নদীর ছোট মাছ খেয়ে বেঁচে থাকত। অবশ্য আমরা ডলফিনকে ডলফিন বলতাম না। বাংলা ভাষায় ডলফিনকে বলে শুশুক। শুশুকের বৈজ্ঞানিক নাম প্লাটানিস্তা গেনজেটিকা। শুশুকগুলো ছিল কালো রঙের। কিন্তু চিকচিক করত। আমরা শুশুকগুলোর সৌন্দর্য দেখে নিতে পারতাম যে মুহূর্তে তারা শ্বাসপ্রশ্বাসের জন্য জলের উপরে মাথা তুলত। কিন্তু শ্বাস নেওয়ার

পরমুহূর্তেই এরা ডুব দিয়ে অনেক গভীরে চলে যেত। দূর থেকে শুশুকদের গতিময় খেলা আমি বেশ উপভোগ করতাম। কিন্তু এই শুশুকদলের সঙ্গেই আছি এমন অনুভূতির কারণে তাদের পুনরায় না দেখতে পাওয়ার কোনো উদ্বেগ আমার ছিল না। এমনকি আমার এই ভয়ও হতো না যে, আমার পায়ের বুড়ো আঙুলকে তারা অজানা কোনো মাছ ভেবে খেয়ে নিতে পারে!

রুডিয়ার্ড কিপলিংয়ের লেখায় বার্মার 'উড়ন্ত মাছ'-এর মনোমুগ্ধকর বর্ণনা পাওয়া যায়—প্রকৃতপক্ষে সেগুলোকে বাস্তবে দেখা যায় পদ্মা ও মেঘনা নদীতে। একটি দুটি নয়, প্রচুর পরিমাণে। নিজের চোখে সেই বাস্তব দৃশ্য অবলোকন করা ছিল এক মোহনীয় দৃশ্যকল্প উপভোগ করা। আমার মা-বাবা তাঁদের সঙ্গে কবিতার অনেক বই এনেছিলেন। কাব্যগ্রন্থগুলো বাংলা ও ইংরেজি উভয় ভাষাতেই ছিল। আমি সেসময় প্রচুর কবিতা পড়েছি। নদীতে ভাসতে ভাসতে কবিতা পাঠ। সেই কবিতাগুলোর মধ্যে, কিপলিংয়ের 'মান্দালয়' কবিতাটাও ছিল। কিপলিং পড়ে আমার একটু বিভ্রান্তি হতো। আমার মনে প্রশ্নের উদয় হতো, বিভিন্ন প্রজাতির মাছের লাফালাফি ইংরেজ এই লেখক কোথায় দেখেছিলেন? বার্মার একটি শহর মৌলমিন। এই মৌলমিনে বসেই তিনি 'মান্দালয়' কবিতাটি লিখেছিলেন। আব্বা আমাকে বলেছিলেন, বার্মায় থাকতে আমরা একবার মৌলমিন শহর দেখতে গিয়েছিলাম। মান্দালয় থেকে মৌলমিন অনেকটা দূরে। যেহেতু কিপলিং কখনো মান্দালয় যাননি, তাই তিনি এত সুন্দর বৈচিত্র্যময় মাছগুলোকে 'মান্দালয় যাওয়ার পথের উপর' বসিয়ে দিয়েছিলেন।

পথের উপর? সেটি কী করে সম্ভব? আমার মনে আছে, কবিতাটি পড়ে আমার অদ্ভুত রকমের অনুভূতি হচ্ছিল। ঘুমাতে যাওয়া সময় আমার কেবলই মনে হচ্ছিল যে এই ইংরেজ লেখকের কাছে কেমন করে ইরাবতী নদীকে একটি রাস্তা বলে ঠাহর করা সম্ভব? অথবা কিপলিং কি এটি বোঝাতে চাচ্ছিলেন যে ইরাবতী নদী কোনো একটি রাস্তার পাশেই রয়েছে? যে রাস্তাটি আমি স্মরণ করতে পারছি না। এমন জরুরি সমস্যার সমাধান কেমন করে হবে, সেটা ভাবতে ভাবতেই আমি ঘুমিয়ে পড়ি। রাত গভীর হয়ে শেষ হতে চললেও কিপলিং আমার সঙ্গেই ছিলেন, এমনকি তাঁর ভাষায় 'বজ্রপাতের মতো ভোর নেমে' আসার মুহূর্ত পর্যন্ত কিপলিং আমাকে ছেড়ে যাননি। রাত ফুরিয়ে নতুন দিনের আলো ফুটতে থাকলে আমি যখন আমার রাতের দুঃশ্চিন্তাকে নির্বাসনে পাঠানোর চিন্তা করছিলাম—নৌকায় যাপিত জীবনের আরেকটি নতুন দিনের জন্য আমার চোখ ও কান তখন আড়মোড়া ভেঙে খুলল—দুঃশ্চিন্তাগুলো নদীর জলে অতি সাবধানে আমাদের ঘিরে সাঁতার দিচ্ছিল।

প্রতিটি নদীর তীরই গ্রামের মানুষজনের আনাগোনায় পূর্ণ থাকত। কিছু গ্রাম সমৃদ্ধ; অন্যগুলো কিছুটা জীর্ণশীর্ণ বলা যায়। কিছু গ্রাম এতটাই ছোট্ট যে, দেখলে মনে হবে যেন পানির কিনারে ঝুলে আছে। দেখতে গেলে অল্পতেই ফুরিয়ে যায়। এমন ছোটখাটো গ্রাম দেখে আম্মাকে জিজ্ঞেস করলাম, এগুলো তো সামান্য পানি বাড়লেই ডুবে যাওয়ার বিপদে পড়তে পারে বলে মনে হচ্ছে। আম্মা বললেন যে, হ্যাঁ, তারা তো ঝুঁকিতেই আছে। সত্যিকার অর্থে সাদা চোখে দেখে তাদের অবস্থা যা মনে হয়েছিল,তাদের প্রকৃত অবস্থা তার চেয়েও বিপজ্জনক ছিল। সেসব বিপন্ন গ্রাম দেখে আমার মনে হতো—নদীর তীরগুলোকে ঘেরা দিয়ে ফেললে হয়তো নদীর জলের গ্রাস থেকে সেসব গ্রাম বাঁচানো যেতে পারে। বাঙলার নদী হলো এ অঞ্চলের সমৃদ্ধির মূল উৎসগুলোর মধ্যে প্রধানতম। তবে এই নদীগুলোইআবার মানুষের জীবন ও নিরাপত্তাকে প্রচণ্ড ঝুঁকির মধ্যে ফেলে দেয়, অকল্পনীয়ভাবে। নদীতীরের জীবন যে কতটা কঠিন সংগ্রামের, বিশেষ করে নদীভাঙন ও তার গতিপথের পরিবর্তন মানুষগুলোর অস্তিত্ব রক্ষার যে সংকট তৈরি করেছে, তা আমার মনকে একবারে আচ্ছন্ন করে ফেলে। বিপদ ও সুন্দরের এমন ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ও তাদের মেলবন্ধন আমাকে এখনো মুগ্ধ করে রাখে। কিন্তু তা সত্ত্বেও মুগ্ধ নয়নে সৌন্দর্য উপভোগ অন্যরকম

অনুভূতি—সে মুহূর্তে নদীদেহের মহিমা আমার মনকে একেবারে আচ্ছন্ন করে ফেলে এবং নদীবুকের প্রাণবৈচিত্র্য দেখে আমি আপ্লুত হয়ে পড়ি। মুদ্রার অন্য পিঠের বাস্তবতা কিন্তু ঠিক এর বিপরীত। নদীর দ্বৈত স্বভাবের মাত্রাটি আমি ধীরে ধীরে উপলব্ধি করেছি। আমি বুঝতে পেরেছি পূর্ব বাঙলার মানুষের মনের মধ্যেও নদীর মতোই দ্বৈত স্বভাব সহজাতভাবে রয়েছে।

সাধারণত শান্ত হয়ে থাকা বাঙলার নদীগুলোর রূপের সৃষ্টিশীল সৌন্দর্যের মুগ্ধতা একমাত্র মিলতে পারে নদীগুলোর বদরাগী হয়ে বিপুল ধ্বংসযজ্ঞ চালানোর মতো বিপরীত বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে। এই দ্বৈত স্বভাবের বৈশিষ্ট্য প্রতিফলিত হয় নদীগুলোর নামের ভেতর। বাঙলার নদীগুলোর নামকরণে এবং তার আগে-পরে যেসব বিশেষণ দেওয়া হয়, তার সবই অতি যত্নে প্রদত্ত—এগুলো তাদের ভেতরের এই দ্বৈত স্বভাবকে খুব যত্নসহকারেই প্রকাশ করে। বাঙলা অঞ্চলে নদীর নামগুলো খুব সুন্দর ও আকর্ষণীয়। উদাহরণস্বরূপ ময়ূরাক্ষী নদী, যার লিখিত নাম 'ময়ূরাক্ষি' (ময়ূরের চোখ), রূপনারায়ণ (স্বর্গীয় সৌন্দর্য), মধুমতি (মধুর মতো মিষ্টি), ইছামতি (আমাদের বাসনাকে যে পূর্ণতা দেয়), এবং আমাদের নিকটবর্তী পদ্মা (পদ্মফুলের মতো)। নদীর এই নামের ভেতরেও প্রায়শই ঘটা বন্যা ও নদীভাঙনের বৈশিষ্ট্যগুলোও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এখানেই শেষ নয়। এই নামের ভেতরে নদীর শহর ও গ্রামকে ডুবিয়ে দেওয়ার বৈশিষ্ট্যের বিষয়টিও উল্লেখ থাকে। উদাহরণস্বরূপ—পদ্মা নদীর আরেক নাম হলো কীর্তিনাশা। কীর্তিনাশা মানে হলো মানুষের সব অর্জন যে বিনাশ করে দেয়। যখন আমি ঢাকার সেন্ট গ্রেগরি স্কুল থেকে শান্তিনিকেতনে চলে আসি, সেই স্থানান্তরকেও 'কীর্তিনাশা' হিসেবে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। কারণ, আমার জীবনের দুই ধারের মতোই এক পাড় অর্থাৎ আমার ঢাকার জীবন ভেঙেশান্তিনিকেতনেআমার জীবন গড়ার ব্যাপারটিও রয়েছে—যে জীবনটি একসময় অতি যত্নে গড়া হয়েছিল—ঢাকার জীবনের কীর্তিনাশা নদীর সে পাড় ভেঙে সেখান থেকে এর বিপরীত প্রান্তে শান্তিনিকেতনে অজেয় এক জীবন গড়া হয়েছিল। অজেয় অর্থ অপরাজেয়। বছরের অধিকাংশ সময় যে নদীটি শান্ত থাকে, বর্ষা মৌসুমে সেটি অকল্পনীয়ভাবে ফুলে-ফেঁপে উঠে অনেক বড় বড় শহর-গ্রাম আর আশপাশের এলাকা একেবারে ভাসিয়ে নিয়ে যায়। বাঙলার নদীর এই দ্বৈত স্বভাব সমাজে মানুষের নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠার সংগ্রামের দ্বৈত ধারাটির সঙ্গে মিলেমিশে একাকার হয়ে যায়। বাঙলার সমাজের ভেতর প্রবাহমান ক্ষয়িষ্ণু ও সহযোগিতার যুগল বৈশিষ্ট্যের এই পিচ্ছিল পথেই সমাজের মানুষ আস্থা রেখে চলে।

তিন.

আমাদের এক মাসের নৌ-জীবনে আমরা ছোটখাটো নদী থেকে বড়সড় নদীর দিকে যখন যাত্রা করলাম, তখন জলের রং গেল পাল্টে। ছোট নদীর জলের রং হালকা ধূসর হলেও আমরা যখন বড় নদীতে পৌঁছালাম, সেটির জলের রঙ তখন ছিল নীল। ধলেশ্বরী নদীর নাম রাখা হয়েছে 'ধলেশ্বরী'।এই নামকরণতার সৌন্দর্যের জন্য। ধলেশ্বরী নামটির দুটি অংশ। 'ধল' শব্দটি কিছুটা অপ্রচলিত হলেও এর অর্থ হলো'ফ্যাকাশে রং'। রং অর্থে 'ধলো' হলো সাদা রং, যা কালো রঙের বিপরীত। মেঘনা নদীর জল কৃষ্ণসুন্দর। মেঘনা নামটি মেঘ থেকে এসেছে। বর্ষা মৌসুমে আকাশে যে কালো মেঘের আনাগোনা হয়, সেই মেঘ কালো হলেও কী সুন্দরই না দেখতে! আমাদের ঘিরে থাকা বিস্তীর্ণ জলরাশি সম্ভব সব পন্থাতেই আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করে রাখছিল। আমি রবীন্দনাথ ঠাকুরের দীর্ঘ কবিতা 'নদী' পড়তে শুরু করি। কবিতাটি আমার মনকে একেবারে বিভোর করে রাখল। ইংরেজি শব্দ 'রিভার'-এর অনেক বাংলা অর্থের ভেতর 'নদী'ই বেশির ভাগ লোকে ব্যবহার করে। যদিও নদীর আরও অনেক সমার্থক অর্থ রয়েছে। রবীন্দ্রনাথতাঁর 'নদী' কবিতায় নদীকে কেন্দ্র করে মানুষ ও তাদের জীবনেরমনোমুগ্ধকর দৃশ্যকল্প তুলে

ধরেছেন। সম্ভবত এই কবিতা তিনি গঙ্গা নদীকে নিয়েই লিখেছেন। গঙ্গা নদীর উৎপত্তি হলো হিমালয় পর্বতমালায়। হিমালয়ে জন্ম নিয়ে গঙ্গা নদী বহু জনপদের মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত হয়ে সমুদ্রে এসে সমাপ্ত হয়েছে। এই কবিতাটি পড়ে আমার অনুভবে নদীর স্বরূপ উন্মোচিত হলো। আমি এও বুঝতে পারলাম— নদী নিয়ে লোকে কেন এত শোরগোল করে।

ভ্রমণের সময় আব্বা সবসময় মানচিত্র সঙ্গে রাখতেন এবং সেটি দেখেই চলতেন। আমার মনে হতো যে বাঙলার ভূগোল বিষয়ে আমি বড়সড় একজন আবিষ্কারক। আমার মনে হতে লাগল, স্কুলের ভূগোল ক্লাসে আমার এই আবিষ্কার সম্পর্কে অন্য ছাত্রছাত্রীদের তো জানা থাকা উচিৎ। এ সম্পর্কে আমার আত্মবিশ্বাস এমন পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছিল যে আমার উদ্ভাবনটি কেন আমার সহপাঠীরা জানছে না, সেটা ভেবেই আমি খুব পীড়িত হতে লাগলাম। আমার আবিষ্কারটি ছিল—গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্র সম্পূর্ণ বিপরীত দিকে প্রবাহিত হলেও, তারা কিন্তু একই হ্রদ থেকে সৃষ্ট। হ্রদটির নাম মানস সরোবর। মানস সরোবরের অর্থ হলো—মন থেকে যে জলাধারটির জন্ম হয়েছে। হিমালয়ের একেবারে চূড়ায় মানস সরোবর হ্রদ। সংস্কৃত সাহিত্যে মানস সরোবরের বিস্তর প্রশংসা করা হয়েছে। গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্র নদ-নদীদ্বয় দুটি সম্পূর্ণ আলাদা যাত্রাপথে দীর্ঘ এক ভ্রমণ শেষে বাঙলায় প্রবেশ করে পরস্পরের হাত ধরে মিলে যায়। তাদের এই মিলন ঘটে জন্মস্থান থেকে বহুদূরে আসার পর। গঙ্গা নদী সৃষ্টি হয়ে প্রবাহিত হয়েছে হিমালয়ের দক্ষিণ দিক দিয়ে, উত্তর ভারতের সমতল ভূমি দিয়ে সে অগ্রসর হয়েছে। গঙ্গা নদী বিস্তীর্ণজনপদের ভেতর দিয়ে ভ্রমণেরপথ করে নিয়েছে। যাত্রাপথে যেসব ঘন বসতিপূর্ণ প্রাচীন নগর রয়েছে, সেগুলো হলো— ঋষিকেশ, কানপুর ও বানারস (ভারানসি) থেকে পাটনা। অন্যদিকে ব্রহ্মপুত্রের ব্যাপার একদমই গঙ্গার মতো নয়, সম্পূর্ণ আলাদা। ব্রহ্মপুত্র নদ প্রবাহিত হয়েছে হিমালয়ের উত্তর দিক দিয়ে। ব্রহ্মপুত্রের যাত্রাপথের বেশির ভাগ অংশজুড়ে রয়েছে সমতল ভূমি। গঙ্গা নদীর সঙ্গে মিলিত হওয়ার আগে ব্রহ্মপুত্র হিমালয় পর্বতমালা থেকে শুরু করে হাজার মাইল পথ অতিক্রম করেছে। গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্রের মিলনস্থলটির বিশেষ বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয়। ব্রহ্মপুত্র ডানদিকে এমনভাবে মোড় নিয়েছে যে দেখে মনে হবে সে হিমালয়ের পিঠে হাত বুলিয়ে খাতির দেখিয়ে তাকে অতিক্রম করতে চাইছে। অবশ্য ব্রহ্মপুত্রের খাতিরের ধরনটি একটু আলাদা। আমাদের ছেলেবেলার প্রিয় কোনো বন্ধুকে হারিয়ে ফেলে তারপর বহুবছর পর তাকে আবার খুঁজে পেলে যেমন আনন্দ হয়—ব্রহ্মপুত্রের আনন্দটি অনেকটা সেরকমই। আমার এমনতর উপলব্ধির সঙ্গে একটি সংজ্ঞাও যুক্ত করতে হবে, যেটি আমি শিখেছিলাম অল্প কিছুদিন আগে, স্কুলে। সেটি হলো 'দ্বীপ কাহাকে বলে?' তার সংজ্ঞা। দ্বীপের সংজ্ঞায় বলা হয়েছে, দ্বীপ হলো এমন একটি ভূমি, যার চারদিক প্রচুর জলরাশি দ্বারা বেষ্টিত থাকে। নতুন শব্দকোষ জানা থাকা একটি শিশুর তূণে তীর থাকার মতো ব্যাপার। আমি ঠিক করলাম ক্লান্তিকর ও অপ্রয়োজনীয় পণ্ডিতিপনা জাহির করার একটি উৎকৃষ্ট উপায় হলো— লোকদের এই তথ্য জানানো যে এই উপমহাদেশের সবচেয়ে বড় দ্বীপ কিন্তু শ্রীলঙ্কা নয়। সেসময় বর্তমান শ্রীলঙ্কাকে সিলন বলা হতো। কিন্তু তখন আমাদের বলা হয়েছিল, শ্রীলঙ্কা নয় বরং উপমহাদেশের পুরো ভূখণ্ডটাই আসলে গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র ও মানস সরোবর হ্রদের মাঝে আটকে পড়া বৃহৎ এক দ্বীপ।

আমার এই 'আবিষ্কার'-এর কথা ঢাকার সেন্ট গ্রেগরি স্কুলের বাতাসে ছেড়ে দিতে সাহসে না কুলালেও শান্তিনিকেতনের নিরুদ্বেগ পরিবেশে তা প্রশ্রয় পেয়ে পেকে উঠল। অবশেষে আমি আমার ভাবনার পাখিটিকে মুক্ত করতে পারলাম। আমাদের ভূগোল ক্লাসেই সবার সামনে আমি হাটে হাড়ি ভাঙলাম। নতুন কথা শুনে আমাদের ভূগোল শিক্ষক আমাকে লক্ষ্য করে একটি প্রশ্ন ছুড়ে দিলেন। তিনি বললেন, তাহলে আমার এই প্রশ্নের উত্তর দাও তো বাছা! 'ভারতীয় উপমহাদেশে সবচেয়ে বৃহৎ দ্বীপ কোনটি?' শিক্ষকের এই প্রশ্ন শুনে তাকে আমার বেশ গোঁড়া প্রকৃতির মানুষ মনে হলো। কারণ, আমার প্রথাভাঙা

চিন্তাধারাকে তিনি খুব একটা আমলে নেননি, তা বুঝতে পারলাম। কিন্তু আমার স্কুলের সহপাঠী বন্ধুরা সে রকম ছিল না। ভূগোল শিক্ষক আমাকে উদ্দেশ্য করে বলে বসলেন, 'তুমি যা বোলছো, সেটি দ্বীপের সংজ্ঞার ভেতর পড়ে না।' প্রত্যুত্তরে আমি তাঁকে পাল্টা প্রশ্ন করলাম, 'কেন পড়ে না?' জবাবে তিনি বললেন, 'দ্বীপ কাহাকে বলে সেটি ভালো করে স্মরণ করে দেখ বাছা। সংজ্ঞায় বলা আছে—দ্বীপ হবে এমন একটি ভূখণ্ড, যেটির চারদিক জল দ্বারা বেষ্টিত থাকে!' আমার প্রতিবাদী শিক্ষকটি দ্বীপের কাগুজে সংজ্ঞার শেষে অদ্ভুত একটি লেজ লাগিয়ে দিয়ে আমার ওপর তার অবশিষ্ট গোস্‌সা ঝাড়লেন। তিনি বললেন, 'দ্বীপ তাকেই বলতে হবে, যে ভূখণ্ডটির চারদিকে জল দিয়ে ঘেরা থাকবে বটে, তবে সেই জল কোনো যেনতেন জল হতে পারবে না, এমনকি নদীর কিংবা হ্রদের জল তো হবেই না, বরং সেই জল হতে হবে সাগর অথবা মহাসাগরের।' এই কথা শুনে আমি তো থ! কিন্তু আমিও তো ছেড়ে দেওয়ার পাত্র নই।

যা হোক, বর্তমানে ফিরে আসি। কয়েক সপ্তাহ আগে প্যারিসের সেইন নদীর একেবারে মাঝখানে একটি নতুন দ্বীপ জেগে ওঠা নিয়ে কথাবার্তা হচ্ছিল। আমি তখন বললাম যে, এটিকে শুধুমাত্র একটি দ্বীপ বলে ছেড়ে দিলে আমরা বড় ধরনের ভুল করব। আমাদের অবশ্যই এই জেগে ওঠা ভূখণ্ডটিকে পুনর্বিন্যস্ত করতে হবে। এবং সেটি করার এখনই সময়। আমি বলেছিলাম দ্বীপটির নামকরণ অন্যকিছুর নামে করতে। প্রস্তাব হিসেবে বলেছিলাম, 'কুমিরের নামে নামকরণ করা যেতে পারে।' আমার আশপাশের লোকজনকে একটুখানি ঘা দিতে এমনটি বলেছিলাম। স্কুলে ভূগোল ক্লাসে শিক্ষকের সঙ্গে তর্কে আমি শেষপর্যন্ত জিততে পারিনি। ফলে উপমহাদেশের সর্ববৃহৎ দ্বীপ হিসেবে স্বীকৃতিটি সিলনেরই থাকল। তবে আমার নাম স্কুলে ছড়িয়ে পড়েছিল। আমার নামটি সুনামের ছিল না, বরং আমার কিছুটা দুর্নামই হয়েছিল মনে হয়। আমার বদনাম হওয়ার কারণ ছিল বৈকি, যেটি সুস্পষ্ট দৃশ্যমান এবং বাস্তব সেটি অস্বীকার করে, অধিকতর অস্পষ্ট ও উদ্ভট যুক্তিপ্রয়োগের পথে আমার অনিশ্চিত যাত্রার জন্যে।

চার.

শান্তিনিকেতনে অনেক আলাপ-আলোচনায় অর্থনীতি ও সমাজের সমৃদ্ধিতে নদীর ভূমিকা ও গুরুত্বের কথা বেশ জোরেশোরেই প্রতিষ্ঠিত ছিল। রবীন্দ্রনাথ পরিষ্কারভাবে এই সম্পর্ক দেখতে পেতেন। আর এই সম্পর্কটি রবীন্দ্রনাথ উপলব্ধি করতেন বলেই তাঁর রচিত প্রবন্ধগুলোতে যেমন এ নিয়ে লিখেছেন, ঠিক তেমনই তাঁর কবিতায়ও মানুষের সমৃদ্ধিতে নদীর ভূমিকায় সরব থেকেছেন। কিন্তু আমি আমার ছোটবেলায় নদীর তাৎপর্য সম্পর্কে জানতাম না। আমি তখন বুঝতাম না যে, রবীন্দ্রনাথ চিন্তাধারায় একজন অগ্রসর অর্থনীতিবিদের ভূমিকা নিয়েছিলেন। কারণ, ব্যবসা ও বাণিজ্যে নদীর গঠনমূলক ভূমিকা যে কতটা গুরুত্বপূর্ণ, সেটি তিনি তুলে ধরেছিলেন। পরে শান্তিনিকেতন স্কুলের দিনগুলোতে অর্থনীতির ওপর নদীর যে বড় ধরনের গঠনমূলক ভূমিকা রয়েছে—এই সম্পর্কের দিকটি আমি উপলব্ধি করতে সক্ষম হলাম। আরও পরে যখন আমি কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজের ভর্তি হই, তখন এদিকটি আমার গবেষণার একটি বিশেষ আগ্রহের ক্ষেত্রে পরিণত হয়। প্রেসিডেন্সিতে থাকতেই আমি অ্যাডাম স্মিথের এ-সংক্রান্ত বিশ্লেষণী লেখা পড়েছি। অ্যাডাম স্মিথ বাজার অর্থনীতির পরিগঠনে নদীবন্দরগুলোর ভূমিকা নিয়ে চমৎকার সব লেখা লিখেছেন। স্মিথের চোখে আঠারশ শতকের বাঙলা আর্থিক কর্মকাণ্ডে যেরকম সমৃদ্ধ ছিল, সেটি কেবল দক্ষ ও স্থানীয়ভাবে প্রশিক্ষিত শ্রমিকের কারণেই সম্ভব ছিল না, বরং অত্যন্ত শক্তিশালীভাবে নির্ভরশীল ছিল নদী ও নৌচালনাসংক্রান্ত কর্মকাণ্ডের ফলে যেসব আর্থিক সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে, তার সঙ্গেও সম্পর্কিত।

এমনকি অ্যাডাম স্মিথ প্রাচীন সভ্যতার ইতিহাসের স্কেচও আঁকার উদ্যোগ নিয়েছিলেন। সেখানে তিনি দেখিয়েছিলেন—প্রাচীন সভ্যতার মানুষেরা নৌচালনাসংক্রান্ত কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে কীভাবে নতুন নতুন আর্থিক সুযোগ-সুবিধা ভোগ করতে পেরেছে। স্মিথ বিশেষভাবে জোর দিয়েছেন বড় বড় সব খাড়ির[১] ওপর। উদাহরণস্বরূপ ইউরোপের বাল্টিক সাগর[২] ও অ্যাড্রিয়াটিক সাগরের[৩] কথা বলা যায়। ভূমধ্য ও কৃষ্ণসাগর উভয়কেই ইউরোপ ও এশিয়া মহাদেশ দুটি সহভাগ করে নিয়েছে। একইভাবে আরব উপসাগর, পারস্য উপসাগর, ভারত মহাসাগর, বঙ্গোপসাগর এবং এশিয়ার সিয়াম[৪] দেশ—এগুলোই সমুদ্রবাণিজ্যের মাধ্যমে নিজেদের মহাদেশের অভ্যন্তরে পরস্পরের সঙ্গে বাণিজ্যিক কর্মকাণ্ড আরও বাড়িয়ে তুলতে জলপথের সুবিধাকে কাজে লাগাতে পারে। স্মিথের বিশ্লেষণ এটুকুতেই সীমিত ছিল না। উত্তর আফ্রিকার সভ্যতা সৃষ্টির পেছনে নীল নদের যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল, সে কথা স্মিথের বিশ্লেষণের যে সাধারণ ধারাটি আমরা দেখি তাতে বেশ গুরুত্বসহকারেই এসেছে। 'আফ্রিকা মহাদেশের অভ্যন্তরীণ অন্যান্য দেশগুলো'র অনেকখানি পিছিয়ে থাকার জন্য স্মিথ সমুদ্রপথের সুযোগ-সুবিধা কাজে লাগাতে না পারাকে কারণ হিসেবে ব্যাখ্যা করেছেন। স্মিথের ভাষায় 'আফ্রিকার অভ্যন্তরীণ বড় নদীগুলো একে অপরের থেকে অনেক দূরত্বে রয়েছে। এ বিষয়টিই অভ্যন্তরীণ নৌযোগাযোগের সম্ভাবনা সৃষ্টি করতে পারে।'

এশিয়ার ঐতিহাসিক আর্থিক পশ্চাদ্‌পদতার ক্ষেত্রেও একই কারণের কথা বলেছেন স্মিথ। স্মিথ বলছেন, 'কৃষ্ণসাগর ও কাস্পিয়ান সাগরের উত্তর দিকে বেশ খানিকটা এগিয়ে, প্রাচীন স্কাইথিয়া[৫], আধুনিক তারতারি[৬] ও সাইবেরিয়ায় এশিয়া মহাদেশের অবস্থান। তারতারি উপসাগরটি পুরোটা বরফে আচ্ছাদিত থাকায় কোনো নৌযোগাযোগ সম্ভবপর নয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও পৃথিবীর বড় নদীগুলোর কয়েকটি সেই

---

১. খাড়ি হলো কোনো সাগর বা হ্রদের মতো বৃহৎ জলরাশি থেকে স্থলভাগের অভ্যন্তরে ঢুকে পড়া দুই বা ততোধিক দ্বীপের মধ্যবর্তী সংকীর্ণ জলধারা।

২. বাল্টিক সাগর হলো আটলান্টিক মহাসাগরের একটি শাখা। এর চারপাশ ঘিরে রয়েছে ডেনমার্ক, এস্তোনিয়া, ফিনল্যান্ড, জার্মানি, লাটভিয়া, লিথুনিয়া, পোল্যান্ড, রাশিয়া, সুইডেন এবং ইউরোপের উত্তর ও মধ্যভাগের ভূখণ্ড।

৩. অ্যাড্রিয়াটিক সাগর হলো ভূমধ্যসাগরের সর্ব-উত্তরের একটি শাখা। বলকান উপদ্বীপ থেকে ইতালীয় উপদ্বীপকে পৃথক করেছে এই অ্যাড্রিয়াটিক সাগর। বলকান পর্বতমালা পুরো বুলগেরিয়াজুড়ে বিস্তৃত, যেটির নামানুসারে উপদ্বীপটির নাম হয়েছে বলকান উপদ্বীপ। ইতালীয় উপদ্বীপের জন্ম উত্তরের আল্পস পর্বতমালার দক্ষিণে। এখান থেকে শুরু করে দক্ষিণের মধ্য ভূমধ্যসাগর পর্যন্ত ইতালীয় উপদ্বীপের বিস্তার।

৪. বর্তমান থাইল্যান্ড দেশটির পূর্বের নাম ছিল সিয়াম। থাইল্যাণ্ডের আনুষ্ঠানিক নাম কিংডম অব থাইল্যান্ড, যেটি দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় অবস্থিত। এটি ইন্দোচীন উপদ্বীপের একবারে কেন্দ্রে অবস্থিত।

৫. প্রাচীন যুগে স্কাইথিয়া বলা হতো ইউরোপ ও এশিয়ার মধ্যাঞ্চলকে। 'স্কাইথি শবেদর আকবসারক' অর্থ হলো কাস্তে। আর স্কাইথীয় অর্থ যেসব ব্যক্তি কাস্তে দিয়ে কাটে, অর্থাৎ কাস্তেওয়ালা বা কৃষক। ইউরো-এশীয় এ অঞ্চলটিতে পূবের ইরানি কৃষকেরা বেশির ভাগ অঞ্চলজুড়ে বসবাস করতেন। সুনির্দিষ্টভাবে বললে, তারা থাকতেন মধ্য এশিয়া ও পূর্ব ইউরোপের ভিস্তুলা নদীর পূর্ব পাড়ে। গ্রিকরা অস্পষ্টভাবে ধারণা করত যে, এই কৃষকেরা ইউরোপের পূর্ব দিকের শেষ সীমানায় রয়েছে।

৬. তারতারি হলো একটি পোশাকি নাম। পশ্চিম ইউরোপের সাহিত্য ও মানচিত্র অঙ্কনবিদ্যায় এশিয়া মহাদেশের এ অঞ্চলটি বড় একটি অংশ, যেটি ঘিরে রয়েছে—কাস্পিয়ান সাগর, উরাল পর্বতমালা (পৃথিবীর উত্তর থেকে দক্ষিণ দিকে বিস্তৃত উরাল পর্বতমালা রাশিয়ার পশ্চিমাংশ ভেদ করে চলে গেছে, আর্কটিক সাগর থেকে উরাল নদী পর্যন্ত বিস্তৃত এবং এটি কাজাখস্তানের উত্তর-পশ্চিম পর্যন্ত বিস্তৃত), প্রশান্ত মহাসাগর এবং চীন ও ভারতের উত্তরাঞ্চলের সীমানা পর্যন্ত বিস্তৃত এলাকা। এটির এই নামকরণ করা হয়েছিল সেই সময়ে, যখন ইউরোপীয় ভূতত্ত্ববিদেরা এ অঞ্চল সম্পর্কে খুব কমই ধারণা রাখতেন।

দেশটির ভেতর দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে। যোগাযোগ ও বাণিজ্যিক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে এই বড় নদীগুলোর মধ্যে দূরত্ব অনেক, যা বেশ অসুবিধাজনক।' স্মিথের মানবপ্রগতির তত্ত্ব এবং আর্থিক ক্ষমতা বৃদ্ধিতে নদীর অবদান সম্পর্কে যতই আমি পড়েছি, ততই তাঁর ধারণাগুলো বাঙালি সংস্কৃতিতে নদীকেন্দ্রিক উৎসব উদ্‌যাপন পুরো অঞ্চলের মানুষের জীবনযাপনকে সমৃদ্ধ করতে তার গঠনমূলক অবদানের যোগসূত্রটিকে ব্যাখ্যা করতে আমাকে প্রলুব্ধ করেছে। কলকাতায় *ওয়াইএমসি-এর* হোস্টেলের রুমে রাত জেগে স্মিথের লেখা পড়তাম। স্মিথ পড়ে ভাবতাম নদীকেন্দ্রিক বাঙালির প্রাণপ্রাচুর্যে ভরা সংস্কৃতির কথা, যা আমার ছেলেবেলার দিনগুলোকে একেবারে মোহিত করে রাখত।

জীবদ্দশায় অ্যাডাম স্মিথ কখনো ভারতবর্ষে আসেননি। ফলে নিজ চোখে বাস্তব ভারতবর্ষ না দেখলেও স্মিথ বুঝতে পেরেছিলেন, বাঙলার মানুষের জীবনে নদীর গুরুত্ব কতখানি। বাঙলার নদী কীভাবে মানুষের যাপিত জীবন ও সংস্কৃতির সঙ্গে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে রয়েছে, তা স্মিথ অনুধাবন করতে পেরেছিলেন। নদী এবং নদীকেন্দ্রিক বসতির ধারাটি কয়েক হাজার বছর ধরে ব্যবসায় ও বাণিজ্যের একটি কেন্দ্রীয় বিষয়ে পরিণত হয়েছে। ফলে এটি একদিকে যেমন দেশের অভ্যন্তরীণ অর্থনীতিকে পরিপুষ্ট করেছে, অন্যদিকে এসব পণ্য ও ব্যবসায়ের অনেকগুলোই বিদেশে বেশ সুখ্যাতি লাভ করেছিল। শুধু তা-ই নয়, বৈশ্বিক বাণিজ্যের সম্প্রসারণের অনুসন্ধানে এসব সুখ্যাত পণ্যগুলো বেশ কাজে লেগেছিল। চীনা পরিব্রাজক ও বৌদ্ধ পণ্ডিত ফা-হিয়েন ৪০১ খৃষ্টাব্দে এই বাঙলা অঞ্চল থেকেই প্রাচীন শহর তাম্রলিপির কাছের নদীবন্দর থেকে একটি সাধারণ জাহাজে করে শ্রীলঙ্কায় পাড়ি জমান। এরপর তিনি সেখান থেকে জাভা হয়ে সবশেষে আবার চীনে ফেরত আসেন। চীনে ফিরে আসার আগে এবং মধ্যবর্তী সময়ে ফা-হিয়েন প্রায় ১০ বছর ভারতে ছিলেন। প্রথমে হেঁটে তিনি চীন থেকে ভারতে আসেন উত্তর দিকের ভূমি দিয়ে। এই পথে তিনি আফগানিস্তান ও মধ্য এশিয়ার উপর দিয়ে হেঁটে আসেন। এই ভ্রমণের সময় তিনি গঙ্গা নদীর উপর দিকে তৎকালীন পাটালিপুত্রে[৭] (বর্তমান পাটনা) বেশ কিছুদিন বিরতি ও বিশ্রাম নেন। ভ্রমণ শেষে চীনে ফেরত আসার পর ফা-হিয়েন ভ্রমণের এই অভিজ্ঞতা নিয়ে একটি গ্রন্থ রচনা করেন। 'আ রেকর্ড অব বুদ্ধিস্টিক কিংডমস' শীর্ষক গ্রন্থটির পুরোটাই তিনি লেখেন চীনের নানঝিং শহরে ফিরে এসে। ফা-হিয়েন রচিত এ বইটিতে তাঁর নিজের চোখে দেখা ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের অবস্থার বিবরণ রয়েছে। উল্লেখ্য, বইটি চীনা ভাষায় রচিত সবচেয়ে প্রাচীন বই, যেখানে ভারত সম্পর্কে বিশদ বিবরণ পাওয়া যায়।

৭০০ খৃষ্টাব্দে চীনের একজন অত্যন্ত মেধাবী ও উদ্যমী ছাত্র য়ি ঝিং ভারতে আসেন শ্রী বিজয়া (বর্তমানে যে অঞ্চলটির নাম সুমাত্রা) অঞ্চল দিয়ে। বাঙলার তাম্রলিপিতে আসার আগে য়ি ঝিং ভারতে থেকে এক বছরেরওবেশি সময় সংস্কৃত ভাষা শিক্ষায় ব্যয় করেন। তাম্রলিপি থেকে তিনি নদীর উজান দিকে রওয়ানা হন এবং এসে পৌঁছান এমন এক জায়গায়, বর্তমানে আমরা যে অঞ্চলটিকে বিহার বলে জানি। তিনি বিহারে অবস্থিত প্রচীন বিশ্ববিদ্যালয় নালন্দায় যোগ দেন। নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় সে সময় উচ্চশিক্ষার বৈশ্বিক কেন্দ্রে পরিণত হয়েছিল। নালন্দার সমৃদ্ধ জ্ঞানচর্চার বিকাশ ও সুখ্যাতি পঞ্চম খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভ থেকে শুরু করে দ্বাদশ খৃষ্টাব্দের শেষ সময় পর্যন্তধীরে ধীরেসারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়েছিল। য়ি ঝিং তাঁর বাস্তব অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে একটি

---

৭. উত্তর-পূর্ব ভারতের অধুনা পাটনা বিহার রাজ্যের অন্তর্গত একটি শহর। প্রাচীন ভারতে পাটনার নাম ছিল পাটালীপুত্র। খৃষ্টপূর্ব ৪৯০ সালে এ নগরটির পত্তন করেন মগধ শাসক অজাতশত্রু। গঙ্গা নদীর দক্ষিণ দিকের তীরের বিহার রাজ্যের অদূরবর্তী পাটালীপুত্রকে মগধ শাসক একটি দূর্গ হিসেবে গড়ে তোলেন বহিঃশত্রুর হাত থেকে সুরক্ষার জন্য।

গ্রন্থ রচনা করেন, যেখানে প্রথমবারের মতো তিনি জ্ঞানের অগ্রগতির বিভিন্ন তুলনামূলক আলোচনা করেন। গ্রন্থটিতে য়ি ঝিংচীনা ও ভারতীয় ঔষধশাস্ত্র ও গণস্বাস্থ্যবিদ্যা চর্চার অগ্রগতির তুলনামূলক চিত্রও উপস্থাপন করেন।

৭০০ খৃষ্টাব্দের অন্তিম ক্ষণে এসে কলকাতার কাছে গঙ্গামুখটি ভারতীয় পণ্য রপ্তানির কেন্দ্র হয়ে ওঠে। বিশেষ করে বাঙলার তুলাভিত্তিক নিজস্ব তাঁত দ্রব্যের রপ্তানি ছিল বিপুল পরিমাণে। বাঙলার তাঁতীদের তৈরি উঁচুমানের বস্ত্রের (যেমন মসলিন ও রেশম কাপড়, সুগন্ধি চাল, মসলা ইত্যাদি) সুখ্যাতি ইউরোপসহ সমগ্র পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়েছিল। গঙ্গামুখটিতে ছিল কলকাতা বন্দর। এখান থেকে জাহাজে করে বাঙলার উৎকর্ষিত বস্ত্রই শুধু রপ্তানি হতো না, বরং ভারতবর্ষের উত্তরাঞ্চলের বিখ্যাত সব পণ্যও (এর মধ্যে পাটনার লবণপাত্রের খ্যাতি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য) বিভিন্ন দেশে রপ্তানি হতো। বাঙলা অঞ্চলটি বাণিজ্যিকভাবে লাভজনক ও আকর্ষণীয় কেন্দ্র হয়ে ওঠার কারণে বিদেশি বাণিজ্যিক কোম্পানিগুলো এ অঞ্চলের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়েছিল। এটাই ছিল বিদেশি কোম্পানিগুলোর বাঙলায় আসার মূল কারণ। ব্রিটিশ বাণিজ্যিক ফার্ম ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিও অন্য বিদেশি বাণিজ্যিক ফার্মগুলোর মতো একই কারণে বাঙলা অঞ্চলে এসেছিল। পরবর্তী সময়েইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ভারতে ব্রিটিশ-ভারতীয় সাম্রাজ্যের গোড়াপত্তন করে। ইংরেজরা কলকাতায় প্রতিষ্ঠা লাভের পর, তারাই যে সমগ্র বাঙলা অঞ্চলজুড়ে একচেটিয়াভাবে নতুন নতুন ব্যবসায়-বাণিজ্যের ক্ষেত্র অনুসন্ধান করছিল, তা কিন্তু নয়। আরও যারা ব্যবসায়-বাণিজ্যের টানে এই বাঙলায় এসেছিল, তাদের মধ্যে ছিল—ফরাসি, পর্তুগিজ, ওলন্দাজ, প্রুসীয়, দিনেমার ও ইউরোপীয় মহাদেশের অন্য আরও অনেক দেশের বিভিন্ন কোম্পানী।এরা বাঙলা অঞ্চলে থেকেই ব্যবসায়-বাণিজ্য পরিচালনা করত।

প্রথমদিকে পূর্ব বাঙলার অভ্যন্তরে এক অঞ্চল থেকে অন্য অঞ্চলে ব্যবসায়-বাণিজ্যের জন্য যোগাযোগ বেশ দুরূহ ছিল। এর প্রধান কারণ ছিল নৌপথে পণ্য পরিবহনের জন্য যোগাযোগব্যবস্থাটি তখন পর্যন্ত ছিল সমস্যাসংকুল। কিছু তথ্যপ্রমাণ সাক্ষ্য দেয় যে নদীপথে যোগাযোগব্যবস্থার উন্নতির সম্ভাবনা বেড়ে গিয়েছিল। ফলে কোম্পানিগুলো ব্যবসায় ও বাণিজ্যের সম্ভাবনার নতুন আশা দেখছিল। এর কারণ ছিল, একদিকে গঙ্গার মূল আদি ধারাটি— সেসময়কার হুগলি, যেটি এখন পশ্চিমবঙ্গের কলকাতা—এর মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছিল, তাতে পানির পরিমাণ কমে আসছিল। কারণ, সেখানে প্রচুর পরিমাণে পলি জমে গিয়েছিল। তবে অন্যদিকে ধারাবাহিকভাবে সময় যতই গড়াচ্ছিল পূর্ব বাঙলায় গঙ্গার পানির প্রবাহ ক্রমেই বাড়ছিল। বাঙলা অঞ্চলের মাটির বৈশিষ্ট্য ও ধারাবাহিকভাবে পলি জমার কারণকে কাজে লাগিয়ে এখানে গঙ্গার প্রবণতা ছিল—যাত্রাপথের তীরবর্তী অঞ্চলকে প্লাবিত করেই ক্রমশ পূর্ব দিকে অগ্রসর হওয়া। এই পানি ছড়িয়ে পড়ার সুযোগেইগঙ্গাতার যাত্রাপথে অনেক নতুন ছোট ছোট নদীর জন্ম দিয়ে সম্মুখে এগিয়েগেছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় এসব শাখানদীর কথা, যার মধ্যে রয়েছে—ভৈরব, মাথাভাঙা, গড়াই-মধুমতিসহ আরও বেশকিছু নদ-নদী। ষোড়শ শতকের শেষ ভাগে পদ্মা যখন বিশাল এবং প্রমত্ত নদী হিসেবে আত্মপ্রকাশ করল, তখন গঙ্গার সঙ্গে তার দূরত্ব ঘুচে সরাসরি সংযোগ প্রতিষ্ঠিত হলো। গঙ্গার সঙ্গে পদ্মার মিলনের ফলে নতুন যে বৃহৎ মিলিত প্রবাহের সৃষ্টি হলো, সেটাই গঙ্গার আদি মূলধারাকে প্রধান ধারায় পরিণত করল, যা বিপুল পরিমাণ জল পূর্ববঙ্গে তথা এখনকার বাংলাদেশে প্রবাহিত করল। গঙ্গার গতিধারার এই পরিবর্তনের ফলে তাৎক্ষণিকভাবেই পূর্ববঙ্গের অর্থনীতি বিপুলভাবে সমৃদ্ধ হয়েছে। কারণ, নদীপথে সংযোগের এই সুবিধা পূর্ববঙ্গকে সমগ্র উপমহাদেশের সঙ্গে সরাসরি যুক্ত করার পাশাপাশি বিশ্ববাজারের সঙ্গে যোগাযোগে ব্যাপক অগ্রগতি সাধনের দ্বার খুলে দিয়েছে। এর ফলে বিশ্ব অর্থনীতিতে ইতিবাচক প্রভাবের পাশাপাশি পূর্ববঙ্গেরই অভ্যন্তরেও আর্থিক কর্মকাণ্ডের ব্যাপক বিস্তৃতি

ঘটে। পূর্ববঙ্গের আর্থিক সমৃদ্ধির বড় প্রমাণ পাওয়া যায় সপ্তদশ শতকে মুঘল শাসকদের[৮] সরকারি আয়ের বিবরণ দেখে—এ সময় খুব দ্রুততার সঙ্গে রাষ্ট্রীয় কোষাগার অল্প সময়ের ভেতরেই পূর্ণ করা সম্ভব হয়েছিল। মুঘল সম্রাটদের করব্যবস্থা থেকে আয় সবচেয়ে দ্রুত হয়েছিল এই পূর্ববঙ্গ থেকেই।

দেশের বাইরেঅর্থাৎ বিদেশের ক্ষেত্রেও দেখা যাবে—দ্বিতীয় শতকে জ্যোতির্বিদ টলেমি তাঁর দেশের নানা অঞ্চল নিয়ে বেশ বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। 'গঙ্গা নদীর পাঁচ মাস' শীর্ষক আলোচনাতে তিনি সঠিকভাবেই চিহ্নিত করেছেন, গঙ্গা নদীর জলরাশি বঙ্গোপসাগরে পৌঁছাতে পাঁচ মাস সময় লাগে। টলেমির সে লেখার বর্ণনা থেকে অবশ্য নির্দিষ্টভাবে কোন কোন অঞ্চল সমৃদ্ধ ছিল এবং কোন শহরগুলো প্রাণপ্রাচুর্যে ভরপুর ছিল, সে তথ্য উদ্ধার করা কঠিন।তা সত্ত্বেও তাঁর আলোচনায় এ অঞ্চলের ব্যবসায়-বাণিজ্যের অবস্থার চিত্র যথেষ্ঠ প্রশংসনীয়ভাবেই ফুটে উঠেছে। এ অঞ্চলের ব্যবসায়-বাণিজ্যের সমৃদ্ধির বিষয়টি মোটা দাগে অন্য যেসব লেখকের লেখায় উঠে এসেছে, তাঁদের মধ্যে রয়েছেন ভার্জিল[৯] এবং প্রবীণ প্লিনি[১০]। এর প্রায় দেড় হাজার বছরের বেশি সময় পরে অ্যাডাম স্মিথ তাঁর লেখায় এ অঞ্চলের অর্থনৈতিক গুরুত্বকে খুবই স্পষ্টভাবে স্বীকার করে গেছেন। স্মিথ যে অঞ্চলটির কথা বলেছেন, সেটি হলো সমসাময়িক সময়ের কলকাতার নিকটবর্তী অঞ্চলসমূহ।

---

৮. মুঘল শাসকেরা ভারতবর্ষ শাসন করেছিলেন ১৫২৬ থেকে ১৮৫৭ সময়কাল পর্যন্ত। তাদের শাসনকাল ছিল ৩০০ বছরেরও বেশি। দীর্ঘ সময়ের শাসনকালে তাদের করব্যবস্থা থেকে রাষ্ট্রীয় আয় আসত বিভাজিত অঞ্চলগুলো থেকে। বিভিন্ন অঞ্চলে তারা কখনো গভর্নর প্রথা, সরকার প্রথা, জেলা কিংবা পরগনাব্যবস্থার মাধ্যমে একাধিক গ্রামকে মহলের আওতায় সংযুক্ত করত। শ্রমবিভাজনের মতো অঞ্চল বিভাজনের মাধ্যমে মুঘলরা শাসনব্যবস্থা চালালেও এর কেন্দ্রীয় শাসক রাজধানী থেকেই সবকিছু পরিচালনা করতেন এবং চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত দিতেন। দীর্ঘ ৩০০ বছরের বিভিন্ন সময়ে মুঘল সাম্রাজ্যের রাজধানী বহুবার বদলেছে—আগ্রা, বিহার, লাহোর, ফতেহপুর সিক্রি এবং শেষে দিল্লিতে বসে মুঘল সাম্রাজ্যের শাসনকাজ পরিচালনা করতেন বিভিন্ন মুঘল কেন্দ্রীয় শাসক, সুলতান বা সম্রাটরা। উদাহরণস্বরূপ—সম্রাট বাবর এতটাই যুদ্ধে লিপ্ত ছিলেন যে, তাঁর চার বছরের শাসনকালে তিনি সরকারি আয় বা করব্যবস্থার দিকে নজর দিতে প্রায় কোনো সময়ই পাননি। বাবরের উত্তরসূরী তাঁর ছেলে হুমায়ুনও আয় বাড়াতে ব্যর্থ হয়েছেন। কারণ, তিনি জীবনের অধিকাংশ সময়েই নির্বাসনে কাটিয়েছেন। মুঘল সম্রাট হুমায়ুনের পর ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হন আফগান নৃতাত্ত্বিক গোষ্ঠীর বংশোদ্ভূত—শেরশাহ সুরি (জীবনকাল: ১৪৭২-১৫৪৫, মুঘল সম্রাট হিসেবে শাসন করেন: ১৫৪০-১৫৪৫)। নতুন মুঘল সম্রাট শের শাহ সুরি চমৎকার একটি ভূমি করব্যবস্থার প্রচলন করেন, যা সম্রাট হুমায়ুন ও সম্রাট আকবরের মধ্যবর্তী সময়ে অন্য কোনো মুঘল শাসক করতে পারেননি। সম্রাট শের শাহর ভূমি করব্যবস্থার ভেতর আবাদি জমির পরিমাপ পদ্ধতির উন্নয়ন ঘটান সম্রাট হুমায়ুনের পুত্র বিখ্যাত মুঘল সম্রাট আকবর (জীবনকাল: ১৫৪২-১৬০৫, মুঘল সম্রাট হিসেবে শাসন করেন: ১৫৫৬-১৬০৫)। মহান মুঘল সম্রাট আকবর নতুন এই পদ্ধতির নাম দেন 'যাবতি' (পদ্ধতিটি লোকমুখে 'জারিব' নামেও পরিচিত)।

৯. প্রাচীন রোমান কবি ভার্জিলের পুরো নাম পাবলিয়াস ভার্জিলাস মারো। তাঁর জন্ম খৃষ্টপূর্ব সত্তুর সালে এবং তিনি ইহলোক ত্যাগ করেন উনিশ খৃষ্টাব্দে। ল্যাটিন সাহিত্যে তাঁর অন্তত তিনটি কবিতা অত্যন্ত সুখ্যাতি লাভ করে এবং সাহিত্যে স্থায়ী আসন করে নেয়। পশ্চিমা সাহিত্যে ভার্জিলের প্রভাব ব্যাপক ও গভীর। বিখ্যাত দান্তের "ডিভাইন কমেডি" মহাকাব্যে ভার্জিলকে এমন একটি চরিত্রে দেখানো হয়, যিনি লেখককে দোজখে যাওয়ার ও দৈহিক মৃত্যুপরবর্তী মধ্যবর্তী অবস্থায় পৌঁছে দেওয়ার পথপ্রদর্শকের ভূমিকায় থাকেন। ভার্জিলকে রোমের মহান কবিদের মধ্যে অন্যতম হিসেবে গণ্য করা হয়।

১০. প্রবীণ প্লিনির পুরো নাম গেইউস প্লিনিয়াস সেকান্ডাস। তাঁর জন্ম তেইশ খৃষ্টাব্দে ইতালির কোমোতে এবং তিনি ইহলোক ত্যাগ করেন উনআশি খৃষ্টাব্দে। প্লিনি ছিলেন একাধারে একজন রোমান লেখক, প্রকৃতিবিজ্ঞানী ও প্রাকৃতিক দার্শনিক। তিনি রোম সম্রাটের নৌ ও সেনা কমান্ডার ছিলেন, সম্রাট ভেসপাসিয়ানের বন্ধু ছিলেন। প্লিনি "প্রকৃতিবিজ্ঞানের ইতিহাস" শীর্ষক বিশাল একটি গ্রন্থ রচনা করেন, যাকে বর্তমান যুগের জ্ঞানকোষ রচনার মডেল হিসেবে অনুসরণ করা হয়। অবসর সময়ের অধিকাংশই তিনি পড়াশোনা, লেখালেখি, প্রকৃতির রহস্য নিয়ে অনুসন্ধান ও ভূগোলবিদ্যার উন্নয়নে ব্যয় করতেন।

পাঁচ.

বাংলা সাহিত্যে নদীর রূপের মনোমুগ্ধকর বর্ণনার ধ্রুপদী ঐতিহ্য রয়েছে। এটি এত আগের কথা যে বাংলা ভাষার ভাষা হিসেবে আত্মপ্রকাশের সময় থেকেই নদীর ধারাবাহিক উপস্থিতি সবার নজর কাড়ে। আজ থেকে প্রায় এক হাজার বছর আগে, এক হাজার খৃষ্টাব্দে, বাংলা ভাষার স্বতন্ত্র ও পূর্ণাঙ্গ ব্যাকরণ রচিত হয়। সংস্কৃত ভাষা থেকে বাংলা ভাষার জন্ম হলেও আলাদা ব্যাকরণ তৈরির ফলে বাংলা ভাষার সঙ্গে সংস্কৃত ভাষার বিপুল পার্থক্যের সৃষ্টি হয়। কিন্তু এই পার্থক্য সত্ত্বেও ধ্রুপদী সংস্কৃত ভাষার অন্য একটি জনপ্রিয় ধারা—'প্রাকৃত' ভাষার সঙ্গে বাংলা ভাষার বেশ ঘনিষ্ঠ সংযোগ ছিল। বাংলা ভাষার পুরোনো কিংবা ধ্রুপদী গল্পগুলোতে নদীর বিপুল উপস্থিতি রয়েছে। উদাহরণস্বরূপ বহুল পঠিত ও উচ্চমার্গীয় ধ্রুপদী কাব্যগ্রন্থ "মনসামঙ্গল কাব্য"র কথা বলা যায়। এটি রচিত হয় পনের শতকের শেষ দিকে এবং কাব্যটি সম্পূর্ণরূপে নদীকে কেন্দ্র করেই রচিত হয়। মনসামঙ্গল কাব্যর কাহিনী গড়ে উঠেছে গঙ্গা-ভগীরথী নদীকে কেন্দ্র করে। গঙ্গা ও ভগীরথী নদীতে চাঁদ সওদাগরের দুঃসাহসিক অভিযান এবং মনসা শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে তার বিদ্রোহ ও তাদের কাছে তার চূড়ান্ত পরাজয় এবং সর্পদেবী মনসার মরণদংশনে চাঁদ সওদাগরের মৃত্যুর অনিবার্যতা থেকে নিজেকে রক্ষা করতে ব্যর্থ হয়ে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ার পরিণতির দৃশ্যকল্প কী সুন্দরভাবেই না বিধৃত হয়েছে মনসামঙ্গল কাব্যে। মনসামঙ্গল কাব্যের মঞ্চনাটকও আমি দেখেছি। মঞ্চায়নটিও ছিল এককথায় সৃষ্টিশীল ও হৃদয়গ্রাহী।

আগে অবশ্য, অর্থাৎ আমার ছেলেবেলায় মনসামঙ্গল কাব্য পড়ে আমার ভীষণ মন খারাপ হতো। কারণ, আমি চাইতাম প্রতিবাদী চাঁদ সওদাগর কদর্য সর্পদেবী মনসার বিরুদ্ধে জয়লাভ করুক। আমার এও মনে পড়ে, ছেলেবেলায় আমি জনপ্রিয় গল্প ও নাটকে মানুষের তুলনায় অতিপ্রাকৃত সত্তার অতিরিক্ত ক্ষমতা ভোগ করার বিষয়টি লক্ষ করে খুব হতাশ হয়ে পড়তাম। আর মনে মনে ভাবতাম, এইসব অতিপ্রাকৃত সত্তা একদিন না একদিন মানুষের কাছে পরাজিত হবেই। আমার সেই প্রত্যাশার বাস্তবায়ন ঘটত কালেভাদ্রে। যখন আমি ছেলেবেলার গন্ডি পেরিয়ে জীবনের পরবর্তী অধ্যায়ে আমেরিকায় পড়াতে এসেছি, তখন যদি কোনো দিন টেলিভিশন দেখতে বসতাম—তাহলে টেলিভিশনে শক্তিশালী অতিপ্রাকৃত চরিত্রগুলোর ভীষণ জনপ্রিয়তা দেখে কালেভদ্রে প্রত্যাশা পূরণের সেই ছিটেফোঁটা আনন্দগুলোও আমার মাটি হয়ে যেত। বিশেষ করে কেবল টিভিতে রাতের অনুষ্ঠানগুলো ছিল এসবে ভরপুর। টেলিভিশন খুলে প্রথমে ভালোকিছু দেখার আশা নিয়েই আপনি বসবেন। কাহিনীর শুরুতে আপনার মনে সেরকম বিশ্বাসই তৈরি হবে। মনে হবে যেন আপনি যে গল্পটি দেখছেন, সেটি একটি অপরাধ-রহস্য উদ্‌ঘাটনের গোয়েন্দা কাহিনী। গল্পটি গড়িয়ে এমন এক জায়গায় চলে আসবে, যেখানে ভিলেন কোণঠাসা হয়ে আত্মরক্ষার জন্য হঠাৎ তার ধারালো দাঁতসমেত বিরাট হা করল। অতঃপর সেই মুখগহ্বর থেকে হঠাৎ ১০ ফুট লম্বা বিশাল এক জিহ্বা বেরিয়ে এল। এরকম উদ্ভট দৃশ্য দেখে আমার যেমনই লাগুক না কেন, আমেরিকার প্রশিক্ষিত দর্শকেরা কিন্তু আমার মতো খুব বেশি হকচকিয়ে যান না। গল্পের কাহিনীটি যতই চরম পরিণতির দিকে এগোবে—অবশ্য গল্পের পটভূমি এভাবেই তৈরি করা—বাস্তবে আমাদের শরীরের সাধারণ বৈশিষ্ট্যগুলো উল্টে যেতে থাকে। আমার ভাবতে অবাক লাগে যে এই পৃথিবীতে যত দেশ রয়েছে, তার মধ্যে যুক্তরাষ্ট্র হলো জ্ঞানবিজ্ঞানে সবচেয়ে উন্নত ও অগ্রসর দেশ। বিজ্ঞানের মাঠে অগ্রগণ্য একটি দেশের জনগণের মানসকল্পনায় কেমন করে এমনসব গল্প জনপ্রিয়তা পায়, যেখানে অতিপ্রাকৃত সত্তার ভূমিকা এতখানি প্রবল? আমেরিকায় টেলিভিশন খুলে আপনার মনে হতে পারে যে শত শত সর্পদেবীসদৃশ অতিপ্রাকৃত মনসা টিভির গল্পগুলো থেকে বেরিয়ে আসছে, যেগুলো সৃষ্টিতে সৃজনশীল মেধার কোনো ধরনের ছাপই নেই। এসব গল্পের কোনো সাহিত্য-মেধার পরিচয় না থাকলেও, রাতের বেলায় টেলিভিশন থেকে হঠাৎ

বেরিয়ে আসা অতিপ্রাকৃত সত্তাগুলোর গল্প আশ্চর্যজনকভাবে জনগণের মনে ঠিকই ঠাঁই করে নিতে পেরেছে।

প্রাচীন বাঙলার নদীভিত্তিক সাহিত্যগুলোর বিষয়বস্তু (থিম) ও সমকেন্দ্রিকতায় (কনসেন্ট্রেশন) একটি অপরটি থেকে বিপুলভাবে পৃথক থাকত। আমার মনে পড়ে, ছেলেবেলায় আমি বৌদ্ধসাহিত্য পড়ে খুব রোমাঞ্চিত হতাম। যদিও আমি সেই গল্পগুলো নানা মুখ থেকে আগেই জানতাম, পড়তে গিয়ে অনেক সময় চর্বিতচর্বণ মনে হলেও আমি উত্তেজিত হতাম। সংস্কৃত ভাষা জানা থাকায় বাংলা সাহিত্যের প্রাচীন ধ্রুপদী রচনা "চর্যাপদ" (চর্যাপদ সংস্কৃত ভাষায় লিখিত) মূল ভাষাতেই পড়ার স্বাদ পেয়েছি। মনে করা হয় চর্যাপদ রচনার কাল এক হাজার খৃষ্টাব্দ থেকে খৃষ্টাব্দ বারো শত শতাব্দীর মধ্যে। বাংলা ভাষায় লিখিত যত প্রাচীন সাহিত্য পাওয়া যায়, সেগুলোর মধ্যে চর্যাপদই হলো সবচেয়ে প্রাচীন ধ্রুপদী সাহিত্যকর্ম। চর্যাপদ পড়তে গিয়ে এর ভাষিক গঠনে মুগ্ধ হয়ে এর বর্ণনাধারায় আবিষ্ট হতে আপনার সময় লাগবে না। কিছুটা অনুশীলনের পর আপনি পরিষ্কার বুঝতে পারবেন, কীভাবে পুরোনো বাংলা শব্দ সময়ের স্রোতে গা ভাসিয়ে আধুনিক বাংলা শব্দে রূপান্তরিত হয়েছে। কোনো পাঠকের ভাষার ঐতিহাসিক বিবর্তনে আগ্রহ থাকলে দেখতে পাবেন যে, নিবেদিতপ্রাণ এসব বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী তাদের জীবনবোধ ও চর্চায় কোন কাজগুলোকে প্রধান্য দিতেন এবং কী কারণে সেগুলোর প্রধান্য ছিল তাদের জীবনে। চর্যাপদের রচয়িতা সিদ্ধাচার্য ভূসুকু চর্যাপদে পদ্য রচনা করতে পারার আনন্দকে যুদ্ধে বিজয় লাভের গৌরবদীপ্ত আনন্দের মতোই উপভোগ্য বিষয় বলে নিজের উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেছেন। ভূসুকু প্রফুল্লভাবে লিখেছেন, চর্যাপদ লেখায় তিনি এতটাই আনন্দিত—পদ্মা নদীতে থাকা তার সব ধনসম্পদ যদি এই মুহূর্তে ডাকাতিও হয়ে যায়, তবু তার কোনো দুঃখ থাকবে না, বরং এসব থাকার ঝামেলা থেকে তিনি পরিত্রাণ পাবেন। ভূসুকু অত্যন্ত নিচু জাতের একজন মহিলাকে বিয়ে করে বললেন যে, এখন থেকে তিনি (ভূসুকু) 'একজন খাঁটি বাঙালি' হতে পেরেছেন।

সে জন্যই সিদ্ধাচার্য লিখছেন:

> *পদ্মায় যখন আমার বজরা নৌকাকে আমি প্রতিকূল পরিস্থিতির বিরুদ্ধে প্রবলভাবে চালিত করছিলাম, তখনই ডাকাতরা আমার বজরা নৌকাতে যা-কিছু ছিল তার সবই লুটে নিয়ে আমার দুর্দশাকে চরম অবস্থায় ফেলল।*
>
> *ভূসুক, আজ তুমি খাঁটি 'বাঙালি' হতে পারলে একজন চণ্ডাল মেয়েকে স্ত্রীর মর্যাদা দানের কারণেই তুমি তা সম্ভব করেছো।*

ভূসুকু শেষপর্যন্ত জাতচ্যুত ও সম্পদবিযুক্ত হয়ে একজন গর্বিত সাম্যবাদী বাঙালি হওয়ার ধারণা নিজের বাস্তব জীবনে পরিষ্কারভাবে প্রয়োগ করতে পেরেছিলেন। বৌদ্ধ জাতপ্রথার রক্ষণশীলতা ভেঙে তিনি বেরিয়ে এসেছেন অনায়াসে। জাত প্রথার মইটিতে চণ্ডাল জাতটি হলো সবচেয়ে নিচের স্তরের। নিজের জাতপ্রথার সামাজিক দেয়াল ভেঙে তিনি নিচু স্তরের জাতে বিয়ে করে—বাঙালি হতে হলে যে সাম্যবাদী ভাবধারার মানুষ হতে হয়—তার সঙ্গে নিজেকে খাপ খাইয়েছেন।

এক হাজার থেকে বারো শত খৃষ্টাব্দের মধ্যে 'বাঙালি' অথবা 'বাঙাল' হওয়ার অর্থ কী ছিল তা চর্যাপদেই স্পষ্টভাবে উল্লেখ রয়েছে। তবে বর্তমানে বাঙালি বলতে যা বোঝানো হয়, তার সঙ্গে চর্যাপদে বর্ণিত অর্থের মিল নেই। বাঙালি অর্থের আগের উৎস থেকে আমরা দূরে, বহুদূরে চলে এসেছি। সাম্যবাদী অর্থে বাঙালির বিকাশের জন্য আমাদের আরও অপেক্ষা করতে হবে। বরং এক হাজার খৃষ্টাব্দে 'বাঙাল' শব্দ

দিয়ে বোঝানো হতো কোনো একজন ব্যক্তি, যিনি একটি নির্দিষ্ট উপ-অঞ্চল অর্থাৎ বাঙলা অঞ্চল থেকে এসেছেন। এঅঞ্চল থেকে আগত লোকদের "বাঙ্গা"ও ডাকা হতো। এ অঞ্চলটি ভৌগোলিকভাবে পুরোপুরি এখনকার বাংলাদেশের অন্তর্গত। দীর্ঘ সময় ধরে এ অঞ্চলটির নাম ছিল "পূর্ববঙ্গ"। পুরাতন বঙ্গ অথবা বাঙ্গা বলতে যে অঞ্চলকে বোঝানো হতো, তার ভেতর বাংলাদেশের ঢাকা ও ফরিদপুর জেলা অন্তর্ভুক্ত ছিল। ঢাকায় জন্মলগ্ন থেকে ঢাকায় বসবাস করায় বাঙালির আধুনিক সংজ্ঞার মধ্যে আমি পড়ি, এবং ধ্রুপদী বর্ণনার মধ্যেও, যাকে 'বাঙালি' কিংবা 'বাঙ্গালি' বলে অভিহিত করা হয়, তার ভেতরও আমি রয়েছি। এ কারণেই আমি শুধু ভূসুকুর সঙ্গেই অন্তরঙ্গতার সম্পর্ক অনুভব করি তা নয়, অধিকন্তু তার বৌদ্ধধর্মের চর্চার কারণেও আমার সঙ্গে তার নৈকট্যের সৃষ্টি হয়েছে। কারণ, স্কুলে পড়ার দিনগুলোতে আমি গৌতম বুদ্ধের চিন্তাভাবনার প্রেমে পড়ে গিয়েছিলাম। কিন্তু হয়! দুঃখের সঙ্গে বলতে হচ্ছে, হাজার বছরের পুরোনো ভূসুকুর ভাবনা-চিন্তাগুলোর প্রতি আকৃষ্ট হয়ে যখন আমি স্কুলের বন্ধুদের উৎসাহিত করতে উদ্যোগী হলাম, সেটি সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হলো। একমাত্র ব্যতিক্রম ছিল শান্তিনিকেতনে আমার সহপাঠী চীনা বন্ধুটি। আমার চীনা বন্ধুটির নাম ছিল টেন লি। ভূসুকুর বিষয়ে বন্ধু টেন লির আগ্রহ থাকলেও আমি খুব নিশ্চিত নই যে সে আমার চর্যাপদের আবৃত্তি শুনে বুঝতে পারছিল, নাকি আমার মন খারাপ হতে পারে ভেবে সে চুপচাপ আমার বাধ্যগত হয়ে বসে থাকত। অথবা এমনও হতে পারে যে ভূসুকু বিষয়ে তার সত্যি সত্যিই আগ্রহ ছিল বলেই সে খুব মনোযোগ দিয়ে আমার আবৃত্তি শুনত।

ছয়.

বিগত কয়েক শত বছর পূর্ববঙ্গ ও পশ্চিমবঙ্গের বাঙালিদের মধ্যে যথেষ্ঠ রকমের পার্থক্য গড়ে উঠেছে। পূর্ববঙ্গের বাঙালিদের পশ্চিমবঙ্গের বাঙালিরা 'বাঙাল' বলে চিহ্নিত করে থাকে। এই বাঙাল কোনো সম্মানসূচক উপাধি নয়, বরং এর দ্বারা বোঝানো হয় যে তারা পুরোপুরিভাবে অপরিপক্ক রয়ে গেছে। অন্যদিকে পশ্চিমবঙ্গের বাঙালিদের পূর্ববঙ্গের বাঙালিরা 'ঘটি' বলে চিহ্নিত করে থাকে। এই উপাধিও সম্মানসূচক কোনো নাম নয়, বরং অবজ্ঞাই রয়েছে এতে। পূর্ববঙ্গের লোকেরা পশ্চিমবঙ্গের বাঙালিদের পূর্ববঙ্গ সৃষ্টি হওয়ার বিরুদ্ধে বাধাদানকারী হিসেবে দেখতে অভ্যস্ত। ঘটি শব্দটির আক্ষরিক অর্থ হলো হাতলবিহীন মগ। অবশ্য এই বিভাজনের সঙ্গে ১৯৪৭ সালের রাজনৈতিক বিভেদের কোনো নির্দিষ্ট যোগসূত্র নেই। সেসময় ভারত ও পাকিস্তান নামে দুটি রাষ্ট্রের জন্ম হয়। একইসঙ্গে আগের অখণ্ড বাঙলা অঞ্চলটি দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ে। বাঙলার একটি অংশ পূর্ব পাকিস্তানে পড়ে, যা বর্তমানে স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র বাংলাদেশ এবং বাঙলা অঞ্চলটির অন্য অংশটি ভারত রাষ্ট্রের সঙ্গে রয়ে যায়। ভারতের সঙ্গে বাঙলা অঞ্চলের অবশিষ্টাংশ একটি রাজ্য হিসেবে যুক্ত থাকে যেটির নাম পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য। সাতচল্লিশের রাজনৈতিক দেশভাগ ধর্মীয় ভাবধারার ভিত্তিতে সৃষ্ট হলেও দুই বাঙলার বাঙাল ও ঘটিদের মধ্যে সাংস্কৃতিক পার্থক্য বহুদিনের পুরোনো। ধর্মীয় পরিধির বিভেদের সঙ্গে এই বিভাজনের কোনো রকমের সম্পর্কই নেই। বর্তমান বাস্তবতা হলো সংখ্যগরিষ্ঠ বাঙালরা এখন মুসলমান এবং সংখ্যাগরিষ্ঠ ঘটিরা বর্তমানে হিন্দু ধর্মাবলম্বী। তাসত্ত্বেও ঘটি-বাঙালের মধ্যেকার এই রেশারেশি ও প্রতিদ্বন্দ্বিতা ধর্মীয় বিভেদের সঙ্গে খুব কমই সম্পর্কিত।

পূর্ব ও পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে বিভক্তির একটি সামগ্রিক ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট রয়েছে। আমার উপরোল্লিখিত অলোচনাসূত্রকে এগিয়ে নিতে আমরা এ অঞ্চলের ঐতিহাসিক যোগসূত্রের অনুসন্ধান করব। পূর্ববঙ্গের অধিকাংশ অঞ্চল ছিল প্রাচীন বঙ্গ রাজ্যের অন্তর্গত এবং অন্যদিকে পশ্চিমবঙ্গের অঞ্চলটির অধিকাংই ছিল গৌর রাজ্যের অন্তর্গত। পশ্চিমবঙ্গে গৌর রাজা ক্ষমতা লাভের আগে পশ্চিমবঙ্গ থেকে বহুদূরে রাঢ় ও সুহমা রাজা পশ্চিমবঙ্গ শাসন করত। সিদ্ধাচার্য ভূসুকু খুব স্পষ্টভাবেই ইঙ্গিত দিয়েছেন, বাঙলা অঞ্চলের বিভিন্ন

অংশে আলাদা আলাদা সামাজিক প্রথা ও চর্চা প্রচলিত ছিল। অবধারিতভাবেই নানা অঞ্চলে বাংলা ভাষার উচ্চারণভঙ্গির[১১] পার্থক্য ছিল। বিভিন্ন আঞ্চলিক উচ্চারণে পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও তাদের প্রমিত ভাষাটি কিন্তু একই; যদিও তাদের বাংলা ভাষার আঞ্চলিক উচ্চারণভঙ্গি বেশ আলাদা। আবার এমনও দেখা যায়, কিছু কিছু ক্ষেত্রে বাঙাল ও ঘটিদের মধ্যে কিছু মৌলিক ধারণা প্রকাশে একই শব্দগুচ্ছ চয়নের মিল রয়েছে বটে; তা সত্ত্বেও সেগুলোর উচ্চারণভঙ্গি বেশ আলাদা ধরনের। উদাহরণস্বরূপ পশ্চিমবঙ্গের কলকাতা কিংবা শান্তিনিকেতনে 'আমি বলব'কে 'বলব' বলা হলেও একই ভাবের প্রকাশে পূর্ববঙ্গের লোকেরা 'বলব'কে বলবে 'কইব' অথবা 'কইমু'। এক্ষেত্রে দুই বঙ্গে মৌলিক ভাব ও প্রমিত প্রকাশভঙ্গি এক হলেও তাদের শব্দ চয়ন একেবারে আলাদা। ঢাকা থেকে প্রথম যখন শান্তিনিকেতনে আসি, তখন প্রায়ই আমার মুখ ফসকে পূর্ববঙ্গের অঞ্চলিক উচ্চারণ বেরিয়ে যেত। প্রথম প্রথম শান্তিনিকেতনে আমার সহপাঠী বন্ধুরা আমার মুখের ভাষা শুনে কোনো এক অজানা কারণে খুব আমোদ ও মজা পেত। আমার সহপাঠী বন্ধুরা আমার নাম ধরে ডাকার বদলে আনন্দ ছড়াতে আমাকে 'কইব' বলে ডাকত। শব্দটি এতটা পরিচিতি পেয়েছিল যে আমার ডাকনামই হয়ে গেল 'কইব'। কেউ একজন আমাকে কৌতুক করে 'কইব' বলে ডাক দিত। ডাক শুনে আমি ফিরে তাকানো মাত্রই আমার সব সহপাঠী ঘটি বন্ধু সমস্বরে হাসিতে ফেটে পড়ত। সুযোগ পেলেই তারা এ ঘটনার পুনরাবৃত্তি করত। এমনকি আমাকে নিয়ে ঘটি বন্ধুদের এসব ঠাট্টা-তামাশা দুই বছর পর্যন্ত আমার বন্ধুমহলকে আনন্দে ভরিয়ে রেখেছিল। দুই বছর পর আমি বিকল্প শব্দ ব্যবহার করতে শিখলে এবং তারা একই কৌতুকের বারংবার ব্যবহারে কিছুটা ক্লান্ত ও একঘেয়ে হয়ে পড়লে এসবের সমাপ্তি ঘটল।

দুই বাঙলার সবটুকু আঞ্চলিক বিভেদের কতটুকু দ্বন্দ্ব সৃষ্টির জন্য বাঙলা নিজেই দায়ী? দুই গ্রুপের ভেতর এমন নির্দোষ কৌতুকের বিপুল ছড়াছড়ি ছিল। বাঙলা ভাগের আগে, বিশেষ করে অবিভক্ত বাঙলার রাজধানী কলকাতায় ঘটিদের সঙ্গে বাঙালদের অন্তরঙ্গতা ছিল। খুব সম্ভবত একটি বিষয়ে ঘটিদের সঙ্গে বাঙালদের ভেদরেখা খুব স্পষ্ট হয়ে ওঠে, আর সেটি ছিল ফুটবল খেলাকে কেন্দ্র করে। অবশ্য আমেরিকায় ফুটবল খেলা বলতে যে খেলাটিকে বোঝায়, সেরকম মারাত্মক খেলাকে আমি বোঝাচ্ছি না। আমি ফুটবল খেলা বলতে সকার খেলা বোঝাচ্ছি। কলকাতার বহু পুরোনো ফুটবল দল মোহনবাগানকে ঘটিরাই সবচেয়ে বেশি সমর্থন করত। মোহনবাগান দল থেকে অপেক্ষাকৃত নতুন দল ইস্টবেঙ্গল ফুটবল দলটি বাঙালদের সমর্থন আদায় করতে সক্ষম হয়েছিল। ধর্মীয় বিভেদের এখানে কোনো ধরনের জায়গাই ছিল না। এ ছাড়াও আলাদা আরেকটি ফুটবল দল ছিল—তারাও এই দুই দলের মতো দুর্দান্ত খেলত—মোহামেডান স্পোর্টিং। মোহামেডানে সব খেলোয়াড় যে মুসলমান ছিল তা নয়, হিন্দু খেলোয়াড়েরাও সেখানে খেলত। মোহনবাগান বনাম ইস্টবেঙ্গলের খেলা থাকলে বিপুল লোক সমাগম হতো, স্টেডিয়াম থাকত কানায় কানায় পূর্ণ। এটি কেবল তখনকার কথা নয়, এখনো এই দুই দলের খেলা থাকলে লোকে একইরকম উত্তেজনা অনুভব করে। কলকাতার অনেক মানুষই দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে যে এই দুই দলের খেলা বছরের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা এবং এর ফলাফল—অর্থাৎ কে জিতল আর কে হারল—এটা বাঁচা-মরার লড়াই। জন্মসূত্রে আমি ঢাকার ছেলে বিধায় আমি অবশ্যই ইস্টবেঙ্গলের সমর্থক ছিলাম। যদিও স্টেডিয়ামে গিয়ে আমার খেলা দেখা হয়েছে জীবনে একবারই—যখন আমার বয়স ছিল ১০ বছর।

---

১১. ভাষাবিদদের মতে, ভাষার উচ্চারণভঙ্গি বা ইংরেজিতে যাকে আমরা অ্যাকসেন্ট বলে থাকি—সেটি বদলে যায় বাধা পেলে। অর্থাৎ সমতল ভূমিতে চলতে চলতে পথের মাঝে যদি কোনো পাহাড় কিংবা নদী কিংবা অন্য কোনো বাধা পড়ে তবে দুই প্রান্তের ভাষিক জনগোষ্ঠীর উচ্চারণভঙ্গিতে কম বা বেশি পার্থক্য দেখা যায়—যদিও এই দুই জনগোষ্ঠী একই ভাষিক জনগোষ্ঠীর অন্তর্গত।

কিন্তু এই খেলাকে কেন্দ্র করে আমার আগ্রহের কোনো কমতি ছিল না। আমার আগ্রহ ধরে রাখতে পেপার-পত্রিকা সহায়ক ভূমিকা রাখত। যখন তারা দুই দলের হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ের কোনো বিশেষ মুহূর্তের ছবি পত্রিকায় ছাপত, আর আমি সেই ছবি ও রিপোর্ট অনেকক্ষণ ধরে পড়তাম। এই ঘটনার প্রায় ৫৫ বছর পর, ১৯৯৯ সালে আমি অপ্রত্যাশিত এক পুরস্কার পাই ইস্টবেঙ্গলের কাছ থেকে। আমার 'অব্যাহত সমর্থন ও ভক্তি'র জন্য ইস্টবেঙ্গল ফুটবল ক্লাব আমাকে তাঁদের আজীবন সদস্য করে নেয়।

মোহনবাগান বনাম ইস্টবেঙ্গলের খেলার শুধু বিনোদন নয়, আর্থিক ফলাফলও ছিল। কলকাতার বাজারে বিভিন্ন ধরনের মাছের আপেক্ষিক দামের সঙ্গেও এই খেলার ফলাফলের সম্পর্ক ছিল। বেশির ভাগ ঘটি রুই মাছকেই সেরা মাছ মনে করত এবং পূর্ববঙ্গের বাঙালরা সাধারণত ইলিশ মাছের অন্ধভক্ত হতো। খেলায় যদি মোহনবাগান জয়ী হতো, তাহলে রুই মাছের দাম বেড়ে আকাশচুম্বী হয়ে যেত। পশ্চিমবঙ্গের লোকেরা রাতের খাবারে রুই মাছের বিভিন্ন পদ রান্না করে এই বিজয়ের আনন্দকে উৎসবের মতো উদ্‌যাপন করত। একইরকমভাবে, ইলিশ মাছের দামও অনেক বেড়ে যেত, যদি ইস্টবেঙ্গল মোহনবাগানকে হারাতে পারত। তখন আমি জানতাম না যে জীবনে কোনো একদিন আমি অর্থশাস্ত্রী হবো। কারণ, সেসময় আমি গণিতশাস্ত্র ও পদার্থবিজ্ঞানে একনিষ্ঠভাবে নিজেকে বেঁধে ফেলেছি। সেই সময়ে আমাকে পাওয়ার জন্য এই দুই বিষয়ের প্রতিপক্ষ ছিল কেবল সংস্কৃত। সেখানে অর্থশাস্ত্রের কেনো পাত্তাই ছিল না। কিন্তু হায়! যার অর্থশাস্ত্রের কোনো হতেখড়িই হয়নি, সে ভাবছে দাম বাড়ার কারণ কী? মাছের দাম ওঠানামার কারণ অনুসন্ধানে অর্থশাস্ত্রের প্রাথমিক পাঠে সে ঢুকে পড়ছে। বুঝতে চেষ্টা করছে হঠাৎ করে চাহিদা অস্বাভাবিক বেড়ে যাওয়ার কারণ কী। এমনকি আমি তখন ভাবতে ভাবতে অর্থশাস্ত্রের আদি যুগের তত্ত্বও আবিষ্কার করেছিলাম—আমার মনে এসেছিল যে দামের এই অস্থিরতা স্বাভাবিকভাবে বেশিদিনের জন্য হতে পারবে না, এমনকি যদি খেলা শেষ হওয়ার আগেই যদি কারোর ভবিষ্যদ্বাণী বাস্তবের সঙ্গে মিলেও যায়, তবু দামের এই অস্থিরতা বেশিদিনের জন্য হতে পারবে না। ভবিষ্যতে যা ঘটবে বলে অনুমান করা হয়েছিল, খুচরা মাছবিক্রেতারা খেলার ফলাফলে কোন দল জিতবে বলে তারা আশা করছেন—তার সঙ্গে সম্পর্কিত 'সঠিক মাছটি'র সরবরাহ আগে থেকেই বেশি থাকে। বিজয়ী দলের মাছের সরবরাহ এই পরিমাণ করা হয়, যেন বাড়তি চাহিদার জন্য সরবরাহের ঘাটতি দেখা না দেয়, দাম অস্বাভাবিক বেড়ে না যায় এবং তা ক্রেতার ক্রয়সীমার মধ্যেই থাকে। ফলে ফুটবল খেলার ফলাফলের ব্যাপারে অনির্দিষ্ট আগামীর অনুমানের সঙ্গে রুই অথবা ইলিশের যেকোনো একটির দাম উঁচুতে ওঠার সম্পর্কের বিষয়টি খুব পরিষ্কার। খেলায় মোহনবাগান জিতলে রুই মাছের দাম, আর ইস্টবেঙ্গল জিতলে ইলিশ মাছের দাম বেড়ে যাওয়া কিছুতেই ঠেকানো যায় না।

বাজারদর স্থির কিংবা অস্থির হয়ে ওঠার ক্ষেত্রে ঠিক কোন কোন অনুমানগুলো আসলেই কাজ করেছে এবং তার ভিত্তিগুলোই বা কী? সেটি অনুসন্ধান করে বের করা ছোটখাটো আনন্দেরই ঘটনা ছিল বটে—একথা স্বীকার করতে আমার কোনো অসুবিধা নেই। কিন্তু এখান থেকে আমি দ্বিতীয় উপসংহারে পৌঁছেছিলাম। সত্যিকার অর্থেই যদি অর্থশাস্ত্র বলতে এধরনের সমস্যাগুলোকে বাছাই করা বোঝায়—তাহলে এ শাস্ত্রটি আমাদের কী সুবিধা দিতে পারে—এমন প্রশ্ন আমি নিজেই নিজেকে করলাম। এতে কিছুটা বিশ্লেষণী আনন্দও রয়েছে। কিন্তু খুব সম্ভবত এটি পুরোপুরিই অকাজের আনন্দ। আমি কৃতজ্ঞ যে অর্থশাস্ত্রের প্রতি আমার সংশয়ী মনোভাব স্নাতক প্রথম বর্ষে অর্থশাস্ত্রে ভর্তি হওয়ার সিদ্ধান্ত নিতে বাধা হয়ে দাঁড়ায়নি। আমি আনন্দচিত্তে বলতে পারি, অ্যাডাম স্মিথের ধারণা ছিল নাব্যসংকটহীন নদীগুলোর সঙ্গে বিকাশমান সভ্যতাগুলোর আন্তঃসম্পর্কের স্বরূপের সন্ধানে গভীর চিন্তার অবকাশ রয়েছে।

সাত.

বাঙালির জীবনযাত্রা আবহমান কাল ধরে নদীকেন্দ্রিক সনাতনী ধারায় চলছে বিধায় খুব সহজাতভাবেই বাঙালির সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যে নদীভিত্তিক উপমাগুলোই ঘুরেফিরে আসত। নদী একদিকে যেমন মানুষের জীবন ধারনে সাহায্য করে এবং জীবনের সুস্থায়িত্বও দেয়। অন্যদিকে এই নদীই মানুষের বেঁচে থাকার সহায়-সম্বলকে ধ্বংস করে, এমনকি মানুষের প্রাণ পর্যন্ত কেড়ে নেয়। এমন দ্বৈত চরিত্রের নদীকে কেন্দ্র করে যে সমাজ গড়ে উঠেছে ও বিকাশ লাভ করেছে, সেই সমাজের ভেতরও নদীর এই দ্বৈত স্বভাব চলে এসেছে ঠিক যেমন করে আমরা চা পানের জন্য চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিই, সে রকমভাবেই সহজে ও স্বাভাবিকভাবে প্রতিটি বাঙালির সত্তায় নদীর সৌন্দর্য ও বিধ্বংসী স্বভাবের দ্বৈততা নিজেদের অজান্তেই সবার চোখ ফাঁকি দিয়ে সন্তর্পণে ঢুকে পড়েছে।

প্রখ্যাত বাঙালি উপন্যাসিক ও রাজনৈতিক প্রাবন্ধিক হুমায়ূন কবীরের রচিত "নদী ও নারী" উপন্যাসটি প্রকাশিত হয় ১৯৪৫ সালে। হুমায়ূন কবীর এ উপন্যাসে মানুষের জীবনের সঙ্গে নদীর সম্পর্ককে গভীর অর্ন্তদৃষ্টি দিয়ে উপলব্ধি করে দেখিয়েছেন যে, বাঙালির জীবনে নদীর প্রভাব কতটা সুদূরপ্রসারী হতে পারে। আরও একজন অগ্রগণ্য বাঙালি লেখক বুদ্ধদেব বসু হুমায়ূন কবীরের নদী ও নারী গ্রন্থের আলোচনা করেছেন। বাংলা জার্নাল "চতুরঙ্গে" প্রকাশিত গ্রন্থালোচনায় বুদ্ধদেব বসু হুমায়ূন কবীরের গল্পটিতে মানুষের জীবন কীভাবে প্রমত্ত পদ্মার সঙ্গে গভীরভাবে জড়িয়ে আছে, সেদিকটির কথা উল্লেখ করে বলেন, *"বর্ষা মৌসুমে পদ্মা নদী কীর্তিনাশা হয়ে উঠলেও বর্ষা মৌসুম ছাড়া অর্থাৎ শরৎকালে পদ্মা থাকে যথারীতি শান্ত ও নয়নাভিরাম সুন্দর। অন্যদিকে যে পদ্মা মানুষকে এমনতর ভালো জীবন দিয়েছে—সেই পদ্মাই গ্রীষ্মকালের সন্ধ্যায় ভয়ার্ত ঝড়বাদলের যে রুদ্ররূপ নিয়ে হাজির হয়—তা দেখে মানুষ অনাকাঙ্ক্ষিত মৃত্যুর আশঙ্কায় তটস্থ থাকে। বৃষ্টিহীন শুষ্ক গ্রীষ্মের পর মুষলধারার বৃষ্টি যখন মানুষের তিল তিল করে গড়ে তোলা জগৎসংসারের সমস্ত কিছু ভাসিয়ে নিয়ে যায়—তখন পদ্মার উল্‌টো রূপ দেখে মানুষ হতভম্ব হয়ে পড়ে।"*

বাংলা ভাষায় রচিত হুমায়ূন কবীরের নদী ও নারী উপন্যাসটি প্রকাশিত হওয়ার অল্প কিছুদিন পরই এর ইংরেজি অনুবাদ বের হয়। উপন্যাসটির বাংলা শিরোনামে থাকা 'নারী' ইংরেজি তর্জমায় এসে তার লিঙ্গ পরিচয়টি হারায়। গ্রন্থের ইংরেজি শিরোনামটি হয় "ম্যান অ্যান্ড রিভার"। ইংরেজি গল্পটিতে ভূমিহীন একটি পরিবারের বেঁচে থাকার কঠিন সংগ্রামের গল্প উঠে আসে। সেখানে প্রমত্ত পদ্মা নদীর যাত্রাপথের বাঁক বদলের সঙ্গে ভাসিয়ে নেওয়া একদিকের কুল ও নতুন চর সৃষ্টির মাধ্যমে অন্য কুলকে সম্বল করে আকড়ে ধরে বাঁচতে চাওয়ার আশা নিয়ে এগিয়ে যাওয়া একটি পরিবারের জীবনসংগ্রামকে তুলে ধরা হয়েছে। পরিবারের সদস্যরা হুমায়ূন কবীরের মতোই মুসলমান। ধর্মীয় বিশ্বাসের দিক থেকে তারা যার যার ধর্মের অনুসারী হলেও এই পরিবারটি অন্য দশটি নদীকেন্দ্রিক বাঙালি পরিবারের মতোই দুর্দশাগ্রস্থ। ইংরেজি অনুবাদের ভাষায়: *"আমরা জেলে। আমরা কৃষক। আমরা বাড়িঘর করি বালুর উপর, আর খানিক বাদেই নদীর জল সেগুলোকে ভেঙ্গে দিয়ে পরিষ্কার করে ফেলে। তারপর আমরা আবার ঘরদোর করি এরপর আবারও সেগুলো নিশ্চিহ্ন করে দেয় নদী। ভাঙ্গাগড়ার এই খেলা অনন্তকাল ধরে চলছে। অন্যদিকে, আমরা পতিত জমি চাষ করে সোনা ফলাই।"* আমি যখন হাইস্কুলের ছাত্র, তখন *নদী ও নারী* উপন্যাসটি বিপুলভাবে পঠিত ও আলোচিত ছিল। উপন্যাসে যেসব সমস্যা তুলে ধরা হয়েছিল, সেগুলো সবার মনোযোগ কেড়ে নিতে সক্ষম হয়। এককথায় উপন্যাসের গল্পটি ছিল একটি পরিবারের জীবন কীভাবে পদ্মা নদীর কারণে সমৃদ্ধির দেখা পেয়েছিল এবং সেই একই নদীর ক্রুদ্ধ ও কীর্তিনাশা রূপের কারণে তাদের জীবন কীভাবে বিপন্ন হয়েছিল, তার মর্মস্পর্শী আখ্যান এতে রয়েছে।

যা হোক, এ ছাড়াও হুমায়ূন কবীরের "নদী ও নারী" উপন্যাসটির অন্য একটি দিকও রয়েছে, যা বিপুলভাবে সবার মনোযোগ কেড়েছিল। নদীপাড়ে বাঙালির জীবনযাপনে ধর্ম-বর্ণনির্বিশেষে যে গড়পরতা অনিশ্চয়তার সমস্যা সবাইকেই ব্যাতিব্যস্ত করে রাখত এই দৃষ্টিকোণটির বাইরেও মূল বয়ানের সমান্তরালে একটি মুসলিম পরিবারের গল্প কিছুটা বেমানানভাবে মুসলমান বিচ্ছিন্নতাবাদীতার সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হলো। ভারতে সেসময়ে কিছু বছর ধরে হঠাৎ করেই মুসলমান বিচ্ছিন্নতাবাদীরা ক্রমেই শক্তিশালী হয়ে উঠতে পেরেছিল। বাস্তব জীবনে হুমায়ূন কবীর ছিলেন একজন মুসলমান রাজনৈতিক নেতা, যিনি অত্যন্ত দৃঢ়তার সঙ্গে বিচ্ছিন্নতাবাদী ধারা প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। শুধু তা-ই নয়, সাতচল্লিশের দেশভাগের (ভারত-পাকিস্তান ভাগ) পর তিনি ভারতেই থেকে যান। ভারতে তিনি ছিলেন একজন শক্তিশালী ধর্মনিরপেক্ষ রাজনৈতিক নেতা এবং প্রথমসারির চিন্তাবিদ। 'সর্বভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস'-এর প্রেসিডেন্ট মাওলানা আবুল কালাম আজাদের বিখ্যাত রচনা "ভারত স্বাধীন হল", যেটি অহিংস আন্দোলনের পথে ভারতের স্বাধীনতা অর্জনে মানুষকে প্রবলভাবে উদ্বুদ্ধ করেছিল, সেই গুরুত্বপূর্ণ লেখাটিতে হুমায়ূন কবীরেরও অবদান রয়েছে।

"নদী ও নারী" উপন্যাসটি রচিত হয় ১৯৪০-এর দশকে "বাঙালি মুসলমানদের জীবনে এক সংকটময় মুহূর্তকে কেন্দ্র করে।" কিন্তু সংকট থাকলেও সে সময়টি যে 'অনেক সম্ভাবনা'রও ছিল, সে কথা অন্য একজন বাঙালি সাহিত্য সমালোচক জাফর আহমেদ রাশেদ তাঁর লেখায় হুমায়ূন কবীরের সেই দ্বিধাদ্বন্দ্বের দিকটি আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন। অনেক মুসলমান রাজনৈতিক নেতা সেসময় ধর্মভিত্তিক রাজনীতির পক্ষে অবস্থান নিয়ে বিষয়টিকে আরও বাড়িয়ে তুলতে ইন্ধন দেন। মুসলমানদের জন্য "দ্য লাহোর ডিক্লারেশন ফর অ্যান ইন্ডিপেনডেন্ট হোমল্যান্ড" বা "একটি মাতৃভূমির জন্য লাহোর ঘোষণা"তে এই ভাবধারার সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। কিন্তু "বাস্তবে আমরা আসল দ্বিধাদ্বন্দ্বের বিকাশ দেখতে পাই, যেখানে রাষ্ট্রীয় যোগাযোগে মাতৃভাষার দাবি এবং বিশেষত 'মুসলমান সংস্কৃতির' সর্বশ্রেষ্ঠ দাবিকে সযত্নে পাশ কাটিয়ে তার স্থলে সব ধর্ম, গোত্র, জাতপাত ও বিভিন্ন আদিবাসী গোষ্ঠীর সংস্কৃতি ও মাটির বৈচিত্র্যময় সত্তাকে একক ও অভিন্ন অধিকার রক্ষার আন্দোলনে পরিণত করে।"

বাঙালি হিন্দুদের মধ্যেও মুসলমানদের মতো একইধরনের দ্বিধাদ্বন্দ্বের প্রমাণ পাওয়া যায় প্রায় সবধরনের রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক আলাপ-আলোচনায়। সাম্প্রদায়িক হিংসা[১২] হঠাৎ বিস্ফোরিত হয়ে দ্রুত সবখানে ছড়িয়ে পড়লে এই ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতার ভিত্তিতে রাজনৈতিক শক্তির নতুন মেরুকরণ ঘটে। নতুন এই সাম্প্রদায়িক রাজনৈতিক শক্তি পুরো বাঙলাকে নিজের হাতের মুঠোয় বন্দী করে রাখে দেশভাগ ও স্বাধীনতার আগপর্যন্ত। ১৯৪০ এর দশকে এই অশুভ শক্তির কারণেই বিপুল রক্তপাত ও প্রাণহানির ঘটনা ঘটেছিল। এমনকি সেই সময়ে আমাদের মতো স্কুলপড়ুয়া ছাত্রছাত্রীরাও একধরনের উদ্বেগের অবস্থা থেকে

১২. ইংরেজি কমিউনাল ভায়োলেন্সের অনুবাদ সাম্প্রদায়িক হিংসা করেছি। বাংলা শব্দটির মূল শব্দ সম্প্রদায় কোনো খারাপ কিছু বোঝায় না। আমরা কোনো একজন ব্যক্তির পরিচিতির জন্য হরহামেশাই বলি—তিনি অমুক সম্প্রদায়ের কিংবা অমুক বংশের লোক। কিন্তু সম্প্রদায় শব্দ থেকে সৃষ্টি হলেও সাম্প্রদায়িক শব্দটি মোটেও ভ্যালু-নিউট্রাল বা মূল্যবোধনিরপেক্ষ নিরীহ কোনো শব্দ নয়। সাম্প্রদায়িক কথাটির অর্থ হলো, কোনো একটি বিশেষ সম্প্রদায়কে সর্বশ্রেষ্ঠ মনে করে অন্য সব সম্প্রদায়কে অমর্যাদা বা নিচু চোখে দেখা। এটি এমন একটি সমস্যা, যেখানে একটি ভূখণ্ডে বসবাসরত অন্য সব সম্প্রদায়ের জন্য কোনোভাবেই ন্যায্য হতে পারে না। কেননা ন্যায্য হতে গেলে অন্যদেরও সমদৃষ্টিতে দেখার দাবিকে সে জায়গা দিতে পারে না। ইতিহাসে আমরা দেখি, সাম্প্রদায়িকতা কেবল মনোভাবের মধ্যে সীমিত থাকে না, বরং নিজের সম্প্রদায়কে সর্বশ্রেষ্ঠ হিসেবে প্রতিষ্ঠার জন্য বাস্তবে বিদ্যমান অন্য সব সম্প্রদায়ের ওপর হিংসা, বিদ্বেষ ও পেশিশক্তি নিয়ে ঝাপিয়ে পড়ে, অধিকারকে নষ্ট করে হত্যাকাণ্ডের মতো জঘন্য ঘৃণিত অপরাধ করেছে সাম্প্রদায়িক দল বা গোষ্ঠী।

মুক্ত ছিল না; বরং আমরা ওই বয়সেও এ নিয়ে গভীর উদ্বেগ-উৎকণ্ঠার ভেতর থাকতাম। আসলে আমাদের তখন কোনো ধারণাই ছিল না—সাম্প্রদায়িক হিংসার এই বিষবাষ্প হঠাৎ করে কীভাবে এত ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ল। আমরা প্রায়ই কায়মনোবাক্যে প্রত্যাশা করতাম এই পাগলামির পথ থেকে পৃথিবীটা দ্রুত সরে আসুক। পৃথিবীটাকে বিপদের হাত থেকে বাঁচাতে আমরা কোনো কাজে আসতে পারি কি না, এমন পথের সন্ধান করতাম। তবে ভাঙা-গড়ার উভয় স্বভাবের এই নদী কিন্তু ধর্মভিত্তিক বিচ্ছিন্নতাবাদের প্রতি ভাবলেশহীন। নদীর এই ভাবান্তরহীন স্বভাব আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় যে—ধর্ম-বর্ণ-জাতি-গোত্র-সম্প্রদায়গত বিভাজননির্বিশেষে সব মানুষেরই দুরবস্থা সহভাগ করে নিতে হয়। হতে পারে এটাই "নদী ও নারী" উপন্যাসের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য।